ভ্রান্তি শতরূপা

ভ্রান্তি শতরূপা

মুঃ ওমর ফারুক বিন মুঃ আজিজ

হুমায়ুন আজাদের. নারী..

ভ্রান্তি শতরূপা

মুহম্মদ ওমর ফারুক বিন মুহম্মদ আজিজ

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভ্রান্তি শতরূপা

মুহম্মদ ওমর ফারুক বিন মুহম্মদ আজিজ

প্রকাশক

এ এম আমিনুল ইসলাম

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স

৪৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মোবাইল: ০১৭১১ ১২৮ ৫৮৬, ০১৫৫২ ৩৫৪ ৫১৯

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ: বই মেলা-২০১৩ ঈসায়ী

কভার ডিজাইন ও বর্ণবিন্যাস

প্রফেসর'স কম্পিউটার

গ্রন্থস্বত্ব : © লেখক

মুদ্রণে

নিউ পানামা প্রিন্টিং প্রেস

ISBN : 984-31-1426 -0

বিনিময় মূল্য: ১৪০.০০ টাকা মাত্র।

VRANTI SATARURA : A BOOK OF .. WRITTEN BY MOHAMMAD OMAR FARUK BIN MOHAMMAD AZIZ PUBLISHED BY PROFESSOR'S PUBLICATIONS, BORO MOGHBAZAR, DHAKA- 1217. PRICE TAKA- 140.00 ONLY.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ক্রম	বিষয়সূচী	প্রষ্ঠা নং
১.	অবতরণিকা	৭
২.	কভারে নগ্নতা	১৩
৩.	অবৈধ উৎস	১৮
৪.	অবতরণিকা এবং অহমিকা	২২
৫.	ইসলামই সনাতন দ্বীন	৩১
৬.	ইসলামী শরীয়াহ্ই সবচেয়ে প্রাচীন	৩৫
৭.	আল্লাহ্র বিধান পুরাতন হয় না	৪০
৮.	দাসী নিয়ে কথা	৪৮
৯.	বিয়ে মানে বিয়ে	৫৭
১০.	রূপকাহিনীর চারটি বউ	৫৯
১১.	বেহেশত শুধূ পুরুষের নয়	৬৫
১২.	ইসলামে কোন তন্ত্র নাই	৬৭
১৩.	'ফিৎনা'র বাংলা নেই	৮০
১৪.	বিবিধ প্রসঙ্গ	৯৬
১৫.	মুক্তির উপায়	১০৯

www.pathagar.com

আর যে ব্যক্তি নেক আমল করবে, হোক সে নর কিংবা নারী,
সে যদি ঈমানদার (হওয়া অবস্থায়ই তা সম্পাদন করে) তবে
(সে এবং তার মতো) এসব লোকই জান্নাতে প্রবেশ করবে,
(পুরস্কার দেয়ার সময়) তাদের ওপর বিন্দুমাত্রও
যুলুম করা হবে না।

(সূরা আন নিসা, আয়াত-১২৪)

www.pathagar.com

অবতরণিকা

এ দেশে ড-য়ে বিসর্গ ব্রান্ডের লোকদের একটা বড় সুবিধা হলো এই যে, মানুষ তাদের দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করে, সেকালের ভারতে যেমন করা হতো মুনি-ঋষিদের। জ্ঞানের ঘটে কত জল আছে সেটা সাধারণের ধারণার বাইরে। তাই 'ডঃ' সাহেবরা যা বলেন তা-ই তারা মেনে নেয় অকাট্য দলিল হিসেবে। সে কারণেই তাঁদের অনেকেই প্রাকৃতিক সত্যকে গুম করে দিয়ে নিজেদের খেয়ালখুশীর মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে দেন, মিথ্যার পসরাই বইয়ের আকারে বাজারজাত করেন। তাঁদের এক হাতে থাকে 'বৈজ্ঞানিক গবেষণা'র ভেল্কি, অন্য হাতে থাকে 'মুক্ত চিন্তা'র দুর্গন্ধযুক্ত সিগারেট। দুনিয়ার তাবৎ সত্যকে তাঁরা 'ধর্মীয় গোঁড়ামী', 'ধর্মীয় কুসংস্কার' এবং 'ধর্মীয় মৌলবাদ' বলে ভেল্কি আর ধোঁয়ার মতই উড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু সত্য মরে না, তার আয়ু অসীম।

এই পৃথিবীতে সত্য বলে যদি কিছু থাকে তো সেটার শুরু হয়েছে ধর্মের মাঝে। এমন কোন সত্য আজ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি যা পূর্ব থেকেই ধর্মে ছিল না। চর্চা বা অনুশীলনের অভাবে অনেক ধর্মীয় সত্য বিস্মৃতির গহনে হারিয়ে যাওয়ার পর নতুন করে যখন কেউ আবার অনুরূপ কোন সত্য আবিষ্কার করে তখন মনে হয় যেন বিষয়টা নতুন, কিন্তু ধর্মীয় গ্রন্থাবলীর মাঝে খুঁজলে ওর আদল পাওয়া যাবে এবং বলা যাবে যে, বিষয়টা মোটেই নতুন নয়, বরং বহু পুরাতন, ধর্মের মতই পুরাতন। হাজার হাজার উদাহরণ দেয়া যাবে। তবে উপস্থিত উদাহরণ ওই সিগারেট। তামাক ও তামাকের ধোঁয়া এবং যে-কোন মাদক দ্রব্যের ব্যবহার মানুষের দেহ-মন ও নৈতিকতার জন্য ক্ষতিকর বিধায় স্মরণাতীত কাল থেকেই ধর্মীয় বিধানের আওতায় ওগুলো নিষিদ্ধ ছিল। বহু বহু যুগ পেরিয়ে আজ ওটা নিষিদ্ধ করছে বিজ্ঞান। অর্থাৎ – বিজ্ঞান যা আবিষ্কার করল পৃথিবীর শেষ যুগে, ধর্মে তার অবস্থান ছিল দুনিয়ার প্রথম দিন থেকেই। কথিত মুক্ত চিন্তার দোকানীরা সেকালেও তামাক আর মাদকের বেপরোয়া ভক্ত ছিলেন, আজও তাঁরা ও-দুটো বস্তুর শেকল পরেই মুক্ত-চিন্তার বড়াই করে থাকেন। তাঁরা ভার নিয়েছেন মানবজাতিকে মুক্ত করার। কী থেকে তাঁরা মানবজাতিকে মুক্ত করবেন সেটা অবশ্য পরিষ্কার নয়। সম্ভবতঃ তারা নিজেরাও জানেন না। তবে তাঁদের কথা-বার্তা, লেখা-জোখা আর কাজ-কর্ম দেখে মনে হয় তাঁরা নারীকে মুক্তি দিতে চান বস্ত্র আর বিবাহের

www.pathagar.com

বোঝা থেকে, পুরুষকে মুক্তি দিতে চান নারী ও শিশুর দায়িত্বের বোঝা থেকে, দুনিয়াকে মুক্তি দিতে চান ধর্ম আর নিয়ম-কানুনের বোঝা থেকে। অর্থাৎ- তাঁরা তাবৎ মানবিকতা ও নৈতিকতা থেকেই মানবজাতিকে মুক্ত করতে চান। তাঁদের রোখ বস্তুতঃ অবৈবাহিক জনারণ্যের দিকে, যেখানে বিবাহ না থাকার কারণে পরিবার থাকবে না, কিন্তু মুক্ত প্রাণীর মত 'মজা বা **fun**' থাকবে। অর্থাৎ- বিবাহ দরকার নাই, যৌনতাই কাম্য। ওটা মুক্তভাবে চলতে দিতে হবে, এই আন্দারটাই মুক্ত চিন্তা। বড় বিদঘুটে, নোংরা আর কদর্য তাঁদের মানসিকতা। কিন্তু তাঁদের ভাষায় ওই চাহিদাটাই সঠিক, যেহেতু মানুষও এক শ্রেণীর মুক্ত পশু বলে তাঁদের বিশ্বাস। ডারউইন, হেগেল, স্পেন্সার তাঁদের মাথায় এই দেড়হাতি গজালটা ভূয়া তত্ত্বের মুগুর ঠুকে স্থায়ীভাবে ঢুকিয়ে গেছেন। দুনিয়ার সব তত্ত্ব যে বিজ্ঞান নয়, শুধুই হাইপোথিসিস, এ জ্ঞান অনেকের কাছে থেকেই পলাতকা। আমার জানামতে এ দেশের কোন মুক্তচিন্তার ভেন্ডার ডারউইন, হেগেল বা স্পেন্সারের কোন বই পড়েননি ; তবে তাঁরা শুনেছেন, পড়লে ফাঁকিটা হয়ত তাঁদের কাছেও ধরা পড়ে যেত ; নারী-পুরুষ যে গাই-বলদ নয় এই সাদামাটা জ্ঞানটুকু তাঁরা অবশ্যই লাভ করতেন। কিন্তু দুর্ভাগা এ জাতি সে রকম বুদ্ধিমান বুদ্ধিজীবী কখনও পায়নি। বুদ্ধিজীবী বলতে এ দেশ পেয়েছে কতগুলো মগজ-কলোনী, তত্ত্বীয় বিজ্ঞান আর ফলিত টেকনোলজির মাঝে যারা পার্থক্য করতে জানে না,[১] সব তত্ত্ব যে বিজ্ঞান নয় এবং ধর্ম – বিশেষ করে ইসলাম যে অবৈজ্ঞানিক কোন ব্যাপর নয় এই সত্য কথাটা যাদের ধারণায় আসে না, যারা কোরআন পড়েনি (পড়লেও বোঝেনি), যারা বুঝতে পারে না যে, বিজ্ঞানীর তত্ত্ব বা হাইপোথিসিসে ভুল থাকতে পারে, কিন্তু আল-কোরআনে কোন ভুল নেই। তারা বুঝতে পারে না যে, আধুনিক তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের যেটুকু আল-কোরআনের বিরুদ্ধবাদী সেটুকু পরবর্তীকালে নতুন কোন বিজ্ঞানী এসে নতুন তত্ত্বের মাধ্যমে পাল্টে দিতে পারেন। বিজ্ঞান আসলে অসম্পূর্ণ। মানুষের এই সুন্দর পৃথিবীতে টেকনোলজি যতটা নির্ভরযোগ্য তত্ত্বীয় বিজ্ঞান যে ততটা নির্ভরযোগ্য বা বিশ্বস্ত নয় এই স্বাভাবিক বোধশক্তি সম্পন্ন বুদ্ধিজীবী এ দেশ তেমন একটা দেখেনি। কাজী মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মত অধ্যাপকদের এ দুর্ভাগা দেশ তেমন একটা মূল্যায়ন করেনি। কিন্তু আহমদ শরীফ বা হুমায়ুন আজাদের মত অধ্যাপকগণ প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী হিসেবে এদেশে মাল্যভূষিত। কারণ কী, সে ব্যাখ্যা সুখপ্রদ নয়। তবে একটা বড় কারণ বোধ হয় নারী। হুমায়ুন আজাদের 'নারী' তার এক বড় প্রমাণ। বইখানি লেখককে যা দিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী তাঁর নিয়েছে। এ কথার ব্যাখ্যাও সুখপ্রদ

[১] টেকনোলজির উন্নতিকে যারা তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের অকাট্যতার প্রমাণ বলে মনে করেন।

www.pathagar.com

নয়। খ্যাতির শীর্ষে উঠে কেউ এমন হঠাৎ বিতর্কিত হয়ে যেতে পারেন তা 'নারী'র লেখককে না দেখলে কারও বোঝারও সাধ্য হতো বলে মনে হয় না। বইখানি লিখতে গিয়ে তিনি প্রচুর সময়, ধৈর্য আর শক্তি ব্যয় করেছেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে তিনি এদেশের আর দশজন নিম্নশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর মতই নিজেকে অনেকটা অশিক্ষিতের ভূমিকায় নামিয়ে এনেছেন বলে দুষ্কৃত ও মর্মাহত হওয়ার মতো অনেক কারণ বইটিতে সত্যিই ঘটেছে। ভাষা ও সাহিত্যে তিনি বিদগ্ধ পন্ডিত। কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে তার পড়ালেখার যথেষ্ট ঘাটতি ছিল। 'নারী' গ্রন্থে যে ইসলাম চিত্রায়িত হয়েছে তা আসলে ইসলাম নয়, বরং অন্য কিছু। এমন অপমানজনক 'অন্য কিছু' যা মুসলমানরা চেনে না। এ বইখানি সেই বিভ্রান্তির বিপরীতেই এক সত্য ভাষণ।

হুমায়ুন আজাদ এ দেশের সরল-প্রাণ পাঠক কুলের শ্রদ্ধায় বিভূষিত এক নাম। কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ও শিক্ষা-বঞ্চিত হুমায়ুন আজাদ এ জাতির জন্য এক মহাদুর্যোগের হোতা। ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয়ে তিনি তাঁর 'নারী' গ্রন্থে অজ্ঞান-প্রসূত উদ্ভট সব মতামত ব্যক্ত করে প্রায় প্রতিটি পাঠককেই বিভ্রান্ত করেছেন। তাঁরই অবিবেচনা সঞ্জাত বক্তব্যের কারণে এ দেশের অনেক যুবক-যুবতীর কাছে ইসলাম আজ এক বিভিষীকার মত, পুঁতি গন্ধময় এক নর্দমার মত, জ্বরা-জীর্ণ এক পুরাতন সমাধির মত। এ দেশীয় মুসলমানদের খুব অল্প সংখ্যক সন্তানই আজ ইসলামে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে। অধিকাংশ 'শিক্ষিত' নর-নারীই আজ ইসলাম-বিরোধী। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বড় বড় বিষয়ের উপর চমক লাগানো ডিগ্রি অর্জন করলেও নিজ নিজ ধর্মের উপর তাদের শিক্ষা একদম নেই, এ ক্ষেত্রে তারা রীতিমত নিরক্ষর। অনেকেই ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আজাদ সাহেবের মতামতকেই সত্য মনে করে তাঁরই মত করে নিজেদের মতামত গঠন করে নিয়েছে, আজাদ সাহেবের বক্তব্য সত্য কি না তা যাচাই করার মত শক্তি তাদের নেই। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের একজন মক্তব পড়ুয়া চাষী তার নিজ দ্বীনের ব্যাপারে যা জানত, এখনকার মাস্টার'স বা পিএইচডি ডিগ্রিধারীরা তা জানে না। তারা পরস্পরকে বরং বিভ্রান্ত করে। এ বোধ হয় সেই যুগ যে যুগ সম্পর্কে নবী করিম (সঃ) বলে গেছেন যে, জ্ঞান উঠে যাবে, অজ্ঞতা চেপে বসবে, মদ পান করা হবে, ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে ... (দ্রঃ বোখারী, মুসলিম)। এখনকার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া পিইএইচডি ডিগ্রিধরীদের মুখে বা বইয়ে ইসলামের ব্যাপারে উদ্ভট সব কথা-বার্তা শুনে আর তাঁদের জীবন যাপনের পদ্ধতি দেখে হাদীসটির অকাট্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষ করে বাঙলা

www.pathagar.com

বিভাগে, ইসলামের বিষয়াদি চর্চা হয় না, চর্চার সুযোগও নাই। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য যে, ইদানীং কালে দেশের যুবক-যুবতীরা ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান নিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের কতিপয় অধ্যাপককে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করেছে। মনে হচ্ছে যেন ইসলামের সমস্ত জ্ঞানভান্ডার বাঙলা সাহিত্যের মধ্যে ঘাপটি মেরে আছে এবং শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহোদয়গণ সে সব মুক্ত জ্ঞানের অমৃত বাণী বাংলার হতভাগা পাঠককুলের মাথায় পাথর-পুষ্পের মত প্রতিনিয়ত ছুঁড়ে মারছেন। বাস্তবিক এ এক মারণ ব্যাধি। এ ব্যাধির হাত থেকে জাতিকে রক্ষা করার মানসেই এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

হুমায়ুন আজাদের ব্যাপারে এ দেশে অনেক বিতর্ক আছে যা বহুলাংশেই মানসম্মত নয়। লেখক ভুল করতে পারেন, তার বিপরীতে অন্য লেখক তাকে শুধরেও দিতে পারেন, কিন্তু অরুচিকর বিতর্ক অশোভন। লেখার সমালোচনা লেখা দিয়েই হয়, বইয়ের বিপরীতে সত্য প্রকাশ করে বই। সে সত্য গ্রহণ করার মত শক্তি পাঠকের থাকা বাঞ্ছনীয়। আশা করি বাংলার পাঠককুল আমাদের এই অহিংস ও নির্মোহ প্রয়াসকে গ্রহণ করার মত মানসিক শক্তির পরিচয় দেবেন।

এ বইয়ে কোন রাজনীতি নেই, অর্থনীতি নেই, সমাজনীতি নেই। দলমত নির্বিশেষে সকল সত্যপ্রিয় মানুষের জন্য বইটি লিখিত হয়েছে। একমাত্র মিথ্যাশ্রয়ী সুবিধাবাদী এবং বুদ্ধি-প্রতিবন্ধী বুদ্ধিজীবীরা ছাড়া আর কেউ এ বইয়ের বিরোধিতা করবে এমন আশংকা আমাদের নেই।

আরবের সেকালের বিখ্যাত কবি লবীদ ইসলামের বিরোধিতা করে ৩০০ (বর্ণনান্তরে ৩০০০) পংক্তি বিশিষ্ট একটি কবিতা লিখে একবার কা'বা ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। কবিতাটিতে দেব-দেবীর প্রশংসা ছিল, ইসলামের নিন্দা ছিল। লবীদ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন, মুসলমানরা পারলে এর জবাব দিক। পূজারী সমাজ সে কবিতা দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলতে লাগল যে, এবারে মুহম্মদ আর তার সঙ্গীরা অবশ্যই জব্দ হবে। কিন্তু না, মুহম্মদ (সঃ) এর নির্দেশে সাহাবীরা বরং সূরা আল-কাওসার লিখে কবিতাটির পাশে ঝুলিয়ে দিলেন। মাত্র তিনটি ছোট বাক্যের সূরা, তিন পংক্তিও তাতে পোরে না। মুশরিকরা হাসাহাসি করতে লাগল। খবর পেয়ে লবীদ ছুটে গেলেন দেখার জন্য। তিনি দেখলেন, পড়লেন এবং বুঝলেন যে, এ কবিতা নয়, মানুষের রচনাও নয়, অবশ্যই এ আল্লাহ্ কর্তৃক নাজিলকৃত সূরা, অবশ্যই মুহম্মদ (সঃ) আল্লাহ্র রাসূল।

www.pathagar.com

লবীদ পাগলের মত ছুটে গেলেন নবী করিম (সঃ) এর কাছে, কলেমা পড়লেন এবং মুসলমান হলেন।

মহিমান্বিত সূরা আল-কাওসারের সাথে মানুষের রচিত এ ক্ষুদ্র বইয়ের তুলনা চলে না। তথাপি নবী করিম (সঃ) এর আদর্শ অনুসরণ করে আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভের আশায় ঢাউস আকৃতির 'নারী' গ্রন্থ খানার পাশে এটিকে রাখার জন্য পাঠকের হাতে তুলে দেয়া হলো। আশা করি, পাঠকের হৃদয়-মন এতে বিষমুক্ত হবে এবং ইসলামের সঠিক রূপ পাঠকের চোখে ধরা দেবে।

বইটিতে নারীর উল্লেখ আছে নিতান্তই প্রয়োজনের তাগিদে, সত্য প্রকাশের তাগিদে কিংবা উদ্ধৃতির তাগিদে। এ বইয়ে নারীর উল্লেখে কোন অসম্মান নেই, বরং সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধের পরিপূর্ণ প্রকাশ এ বইয়ের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। নারী মায়ের জাতি, বইয়ের পাতায় পাতায় বিকশিত এই স্বাভাবিক সম্ভ্রমবোধ সবাইকে মুগ্ধ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

গ্রন্থখানি আল্লাহ্‌র ক্ষমা আর রাসূল (সঃ) এর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিবেদিত এবং বাংলার সত্যপ্রিয় পাঠকদের জন্য উৎসর্গীকৃত।

বিনীত

লেখক ও প্রকাশক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কভারে নগ্নতা

লেখকের মনের গভীরে এবং স্বভাব ও সংস্কারে নগ্নতা থাকলেই বই আর তার কভারে নগ্নতা স্থান পেতে পারে। পরিশীলিত মনের লেখক নিজেও নগ্ন হন না, তাঁর সৃষ্টিকেও নগ্ন করেন না। মানব সভ্যতার ইতিহাসে নগ্নতা সব চেয়ে বড় অসভ্য নিয়ামক যা সব সময়ই সভ্য জগতকে পীড়া দেয়, মর্মাহত করে। সভ্যতার প্রথম ও প্রধান বিকশিত রূপ পোশাক। সচেতন লেখক তাই নগ্নতা এড়িয়ে চলেন মৃত্যুর মত। আমি অবাক হয়ে তাই ভাবি যে, 'নারী' গ্রন্থের লেখক কি এই সোজা কথাগুলো জানতেন না ? নাকি তাঁর স্মরণ ছিল না ?

বইটির উপর নজর পড়লেই যে-কোন রুচিশীল মানুষ প্রচন্ড ধাক্কা খাবেন। হাতে নিলেই হকচকিয়ে যাবেন। ভেতরে ঢুকলে সংক্ষুব্ধ হবেন। শিল্পের স্বাধীনতা অথবা অসংকোচ প্রকাশের দূরন্ত সাহসের কথা বলে এই বইয়ের নগ্নতাকে যারা পাশ কাটিয়ে যেতে চাইবেন তাঁদের রুচি আর ভব্য চেতনার ব্যাপারে সাধারণের পুরোমাত্রার সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক। শিল্প ততক্ষণই শিল্প যতক্ষণ তার সাথে ভব্যতার বনিবনার অভাব না হয়। আঁকিয়ে ততক্ষণই শিল্পী যতক্ষণ সে ভদ্রলোক, তার কাজ যতক্ষণ সভ্য-মাত্রিক। কিন্তু 'নারী'র কভার ডিজাইনার এ মাত্রার নিচে নেমেছেন। অসংকোচ প্রকাশের লালসায় লেখকও তাঁর নিজস্ব গন্ডী অতিক্রম করেছেন। প্রকাশক ভেঙ্গে ফেলেছেন তাঁর ব্যবসায়িক সততার দেয়াল।

সব মানুষ নারীর সন্তান। নারী মা। বোন। স্ত্রী। কন্যা। সম্মানজনক আরও অনেক কিছু। এঁদের কাউকেই নগ্ন করা যায় না, প্রকাশ্যে তো নয়ই। কিন্তু 'নারী' বইটি এই সহজ ও স্বাভাবিক বিবেকের বাঁধনটুকুও রাখেনি। একেবারে খোলা হাটে, সবার সামনে নারীকে সম্পূর্ণ দিগম্বর করে রীতিমত নিলামে তুলেছে। আশ্চর্য ! কোন মা-বোনের প্রতিবাদও কিন্তু কোথাও দেখা যায়নি। বইটি দেখে অনেক নারীকেই বিস্মিত, হতভম্ব এবং ক্ষুব্ধ হতে দেখেছি ; কিন্তু ছাপার অক্ষরে কেউ প্রতিবাদ করেছে বলে আমাদের জানা নেই। 'প্রগতিবাদীরা' নারীর সম্মান নিয়ে কত কথা বলেন, কিন্তু নারীকে এভাবে যারা প্রদর্শনীর বস্তু হিসেবে বাজারে তোলে তাদের ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতেও কখনও শুনিনি। কথিত প্রগতিবাদীদের এই প্রাগৈতিহাসিক নগ্নতার প্রতি নোংরা সমর্থন দেখে জ্ঞান-গরিমার পবিত্র জগতে তাদের পশ্চাৎপদতার ব্যাপারে শতকরা একশ' ভাগ

www.pathagar.com

নিশ্চিত হওয়াই তাই স্বাভাবিক। দ্বীন-ধর্মের প্রতি প্রগতিবাদীরা কেন মারমুখী তার ব্যাখ্যা এই একটি মাত্র বইয়ের কভারেই মূর্তিমান হয়ে আছে। দ্বীন এবং দ্বীনের অনুসারীরা যেহেতু নগ্নতার শত্রু তারাও সেহেতু দ্বীন এবং দ্বীনের অনুসারীদের এক নম্বর শত্রু। ব্যাপারটা শুনতে যেমনই হোক, স্বঘোষিত প্রগতিবাদীরা আসলে মনে-প্রাণে নগ্ন। তারা নিজেদেরকে 'মুক্ত' বলে জানে এবং 'মুক্ত' হতে হলে আওরতে ছতর বা গোপনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ করা জরুরী বলে মনে করে। মনের এই বিষম ব্যাধি ইউরোপ ও তার সমগোত্রীয় দুটো মহাদেশ (আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়া) থেকে আমদানি হয়ে যে কলোনী যুগে সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই অসুস্থ চেতনার বাইরে বেরোতে এই ব্যাধিগ্রস্ত শ্রেণীটা আজও পারল না। 'নারীমুক্তি! নারীমুক্তি!' বলে চিৎকার করে করে হুঁশ হারিয়ে ফেলল, নারীর শরীর থেকে বস্ত্র খসাতে খসাতে একেবারে আনগ্ন-বিনগ্ন করে ফেলল, কিন্তু হতচ্ছাড়াদের চিৎকার থামল না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, নারীমুক্তি বলতে তারা নারীর বস্ত্রমুক্তিই বুঝে থাকে। সাক্ষী ওই 'নারী' গ্রন্থটি। ওটির আগাগোড়াই নগ্ন। বাইরে-ভেতরে সর্বত্রই নগ্নতা এবং আরও অনেক কিছু যা নগ্নতাকে হার মানায়। অথচ লেখক-প্রকাশক-পাঠক সবারই দাবী, ওটি নারীবাদী গ্রন্থ। নারীর কল্যাণেই নাকি ওটি লেখা হয়েছে। অবাক ব্যাপার! এই যদি নারীবাদ বা নারীমুক্তি হয় তাহলে নারীর শ্লীলতাহানি বা নারীর ওপর বলাৎকার কাকে বলে ! দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ কিংবা এ যুগে আমাদের অসহায় মেয়েদের 'নিঃসহায়' ছবি মোবাইল ফোনে ধারণ করে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে আত্মহত্যায় বাধ্য করার মত দস্যুবৃত্তির সাথে 'নারী' বইটির পার্থক্য কোথায় ?

দন্ডবিধিসহ আরও দু'একটি আইনের সুস্পষ্ট ধারামতে নারীর নগ্ন চিত্র প্রকাশ করা দন্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু এ বইটি বোধ হয় ওইসব ধারার বিধানের চেয়ে অনেক বড়। নইলে এটি এমন দোর্দন্ড প্রতাপে সারা বাংলাদেশ চষে বেড়াতে পারতো না। পাতায় পাতায় 'আধুনিক', 'গবেষণা', 'বৈজ্ঞানিক' ইত্যাদি আকর্ষণীয় শব্দাবলী থাকার কারণেই মনে হয় সবাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। নইলে বইটির বিরুদ্ধে এতদিনে কোন মামলা না হওয়ার বাস্তবিক কোন কারণ দেখা যাচ্ছে না। এদেশে কত উকিল, কত বিচারক স্বপ্রণোদিত হয়ে কত মামলা করেন। তাঁদের মহতী ভূমিকা আমাদের বিমুগ্ধ করে। কিন্তু আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন সত্ত্বেও এ বই নিয়ে আজও কোন মামলা হয়নি। এমন একটি বই তাঁদের কারও নজরে না পড়ার কী কারণ থাকতে পারে তাও

www.pathagar.com

বোঝা যায় না। তাঁরা কি এ বইয়ের কভার এবং বক্তব্যের সাথে সবাই একমত ? বিশ্বাস করা কঠিন।

দেশে সুশীল সমাজ, নারী মুক্তি আন্দোলন, নারী অধিকার আন্দোলন, সাংস্কৃতিক জোট, মহিলা পরিষদ, পরিবেশবাদী আন্দোলন ইত্যাদি নানারকম ফোরাম আছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে অনেক সময়ই তারা তুলকালাম কান্ড বাঁধিয়ে ফেলে। কোন না কোন ইস্যু নিয়ে প্রায় সারা বছরই তারা মাঠ গরম রাখে। কিন্তু আশ্চর্য ! এসব ফোরাম থেকেও কখনও কোন প্রতিবাদ বা সমালোচনা হয়নি। কারও মনেই বিনগ্ন কভারটি কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেনি। প্রতিক্রিয়া হলে অবশ্যই তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতো, কেননা এসব ফোরাম কখনও চুপ করে থাকার বস্তু নয়। মনে হয় নগ্ন হতে পারাটাকে এসব প্রতিষ্ঠানও নারীর অধিকার হিসেবে গণ্য করছে। সী-বীচের নগ্নতা অবশ্য অনেক দেশেই গণ-অধিকার বলে স্বীকৃত, যদিও তাদের আইন-কানুনেও প্রকাশ্য নগ্নতা অপরাধ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। সী-বীচের নগ্নতার মাঝেও অন্ততঃ ব্রা-বিকিনির আড়াল থাকে, কিন্তু 'নারী' বইখানির কভারে সে আড়ালটুকুও নেই। বরং কভারটি দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ওটির জন্য দায়ী কোন ধর্ষকামী মানুষ, দুনিয়ার সব নারীর উপর যে ভীষণ খাপ্পা এবং যৌন-জীবনে যে অনিবৃত্তিহেতু মহাকামার্ত, ক্ষ্যাপা। কিন্তু হিসাব মেলে না। লেখক, প্রকাশক, প্রচ্ছদকার সবাই উচ্চ শিক্ষিত হিসেবে সমাজে পরিচিত ও সম্মানিত। তাঁদের কারও জীবনই অমন ক্ষুধার্ত থাকার কথা নয়। যতদূর জানি, তাঁরা বিবাহিত। লেখকের তো কন্যা সন্তানও রয়েছে। তাঁর গৌরবময় শিক্ষক জীবনে ছাত্রীর সংখ্যাও কম নয়। বইটি যখন প্রকাশিত হয় তখন সম্ভবতঃ তাঁর মা-ও জীবিত ছিলেন। তারপরও নারীর ইজ্জত-বিধ্বংসী এরকম একটা বিস্ফোরক বই তিনি কেন আমাদের মস্তকোপরি নিক্ষেপ করলেন তা বোঝা বড়ই দুষ্কর। আরও আশ্চর্য যে, বইখানি উৎসর্গ করা হয়েছে তাঁরই কন্যাদের নামে ! পিতার পক্ষ থেকে কন্যাদের জন্য সবচেয়ে দামী উপহার ! অবাক হতেই হয়। এ উপহার পেয়ে কন্যাদের কেমন লেগেছে তা অবশ্য জানার কোন উপায় নেই। না জানাই বোধ হয় ভাল।

লজ্জা ঈমানের একটি শাখা। যার লজ্জা নাই তার ঈমান নাই। কারণ, লজ্জার বাইরে ভব্যতা নাই, ভব্যতাহীন সভ্যতা অস্তিত্বহীন ও অকল্পনীয়। অভব্য মানুষের সভ্যতার দাবীও অসার। শুধু গলার জোরে তো আর সভ্য হওয়া যায় না।

www.pathagar.com

এ যুগের অনেক মানুষই ঈমানের ধার ধারে না। ঈমান বলতে তারা বুঝে থাকে অন্ধ বিশ্বাস বা অযৌক্তিক বিশ্বাস। অথচ যুক্তি ঈমানেরই একটা গুরুত্বপূর্ণ শাখা। যুক্তিহীন বিশ্বাস মূল্যহীন। অন্ধ বিশ্বাস তাই ঈমান হতে পারে না। ঈমানের শুরুই হয় যুক্তি দিয়ে। যেমন এই মহাসৃষ্টি জগতের একজন স্রষ্টা অবশ্যই আছেন, এটা যুক্তির কথা, যেহেতু স্রষ্টা ছাড়া কোন কিছু সৃষ্টি হওয়ার কল্পনা অযৌক্তিক তথা অযুক্তিশাস্ত্রীয়। আবার মহাবিশ্বের স্রষ্টা একজনই, এটাও যুক্তির কথা, যেহেতু সবকিছু নিয়মের অধীন ও সুশৃংখল ; একাধিক স্রষ্টা থাকলে অবশ্যই অনিয়ম ও বিশৃংখলা হতো। এই দু'টা যুক্তি একত্র হয়ে মানুষের মনে যা সৃষ্টি করে তা হলো এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান। এ সত্য দিয়েই দ্বীন-ধর্মের শুরু। কাজেই ঈমানকে বা দ্বীন-ধর্মকে যারা যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাস বলে মনে করে তারা নিজেরাই তাদের অন্ধ সংস্কার আর ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আছে। এরকম অন্ধ মানুষের সংখ্যা সমাজে বেড়ে গেলেই এমন লজ্জা-নির্বাসনী বই সমাজে সমাদর পায়। লজ্জা-শরম ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়ে যে বই সৃষ্টি হয়েছে তার পাঠককেও তাই সঙ্গত কারণে নির্লজ্জ হতে হয়। অন্যথায় মর্মপীড়ায় জর্জরিত হয়ে প্রতিবাদী হতে হয়। ঈমানদার কোন লজ্জাশীল ব্যক্তি ক্ষণিকের ভুলে বইটি কিনে হয়তো পড়তেও পারেন, কিন্তু পরবর্তী মর্মপীড়ায় তাকে ভুগতে হবে বহু বছর। এ দেশে অবশ্য মুসলমানদের জন্য বইটি পড়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। অমুসলিমরা তাদের সম্পর্কে কী ভাবে তা জানার জন্য হলেও বইটি তাদের পড়তে হবে। আর একটি কারণে পড়তে হবে। নারীবাদ যে কি জিনিস সেটার আসল রূপ দেখতে হলেও এ বইটি অন্ততঃ একবার হাতে নিতে হবে। সময় থাকতে নিজেদের মা-বোন-কন্যাকে নারীবাদীদের থেকে হুঁশিয়ার করতে হবে। নইলে ওদের খপ্পরে পড়লে হয়তো তাদেরকে কাপড় পড়তেই দেবে না। বস্ত্রের আবরণ থেকে টেনে বের করে হয়ত নারীমুক্তি আন্দোলন সফল করার দাবী করে বসবে। হয়ত সব নারীর উপর তাদের উন্মুক্ত অধিকারও দাবী করে বসতে পারে। সে কারণেই বোধ হয় বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে বইটিতে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ই রয়েছে যার অর্থ একেবারেই পরিষ্কার। নারীমুক্তির নামে নারীবাদী পুরুষরা কি ফাঁদে নারীদের আটকাতে চায় তার একটা মোটামুটি ধারণা তাদের বইয়ের কভার দেখলেই পাওয়া যাবে।

ভেতরে পড়ার যে খুব একটা দরকার আছে তা নয়। ধারণা মোটামুটি কভারেই পাওয়া যায়। ভেতরে বিষয়বস্তুর ফেনিল বর্ণনা রয়েছে বটে, তবে কভারের নগ্নতাকে তা ঢাকেনি, বরং আরও টানাটানি করে আরও 'গভীরে' ঢোকার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে

www.pathagar.com

নগ্নভাবেই। কতটা উত্তেজনাবশে লেখক কলম চালনা করেছেন সেটাই বরং ভাবার বিষয়। প্রচ্ছদকার তার তুলি চালানোর সময়ও বোধ করি খুব একটা আত্মস্থ বা ধাতস্থ ছিলেন না। তাঁর অবশ্য একটা খোঁড়া যুক্তি হাতের কাছে ঘুমন্ত শিশুর মত চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তিনি নিজে কিছু আঁকেননি। বড় বড় নামী-দামী শিল্পীর চিত্রকর্ম সাঁটিয়ে তিনি প্রচ্ছদ খাড়া করেছেন, অতএব তিনি গঙ্গাজলের মত পবিত্র ; কিছু বলার থাকলে ওইসব বড় শিল্পীকেই বলতে হবে। এটা অবশ্য যুক্তি নয়। ফ্যালাসি বা যুক্তিবেশী বিভ্রান্তি। কারণ,

এক ॥ ওইসব বড় বড় শিল্পী 'নারী' বইয়ের কভার করার জন্য ওই চিত্রগুলো আঁকেননি।

দুই ॥ চিত্রগুলো ভব্যতা, সভ্যতা ও নারীর ইজ্জত-আব্রুর বিচারে আজও উত্তীর্ণ নয়, শালীন হিসেবে নারীজাতি বা মানবজাতির সনদপ্রাপ্তও নয়। যা অশ্লীল তা সবার জন্যই অশ্লীল, হোক না তা খুব বড় শিল্পীর আঁকা। স্থান-কাল-পাত্র বিচার মানুষের ইজ্জত-আব্রুর ক্ষেত্রে চলে না। কে কত বড় শিল্পী সেটা বড় কথা নয়, সমাজকে কে কি উপহার দিল সেটাই বড় কথা, সেটাই বিবেচ্য বিষয়।

তিন ॥ চিত্রগুলো 'নারী' বইয়ের কভারে ব্যবহারের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেয়া হয়নি। আইনানুযায়ী অন্যের যে-কোন সৃষ্টির 'রিপ্রোডাকশন' দন্ডনীয় অপরাধ। বাংলা বই, তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজর এড়িয়ে গেছে বলে মনে হয়। বইটির ভাষা ইংরেজী হলে হয়ত এতদিনে অন্য রকম কিছু ঘটে যেত।

এ দেশে বিবেকের কলাপাতা যে যত বেশী ছিন্ন করেছে সে তত বেশী প্রগতিবাদী বলে স্বীকৃত। বইখানির প্রকাশক ইনার কভারে এটিকে এক 'মহাগ্রন্থ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বইটির প্রকাশনা কার্যক্রমকে তিনি ঘোষণা করেছেন 'চিন্তা প্রকাশের স্বাধীনতা' হিসেবে। আমাদের সংবিধানে চিন্তা প্রকাশের স্বাধীনতার উপর স্বতন্ত্র একটি অনুচ্ছেদ আছে ; সেখানে অবশ্য নগ্নতার সুযোগ রাখা হয়নি। অশ্লীলতা ও নগ্নতা পরিহার করে তবেই ব্যক্তি তার চিন্তার স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেদিক থেকে বিবেচনা করা হলে বইটি সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করেছে বিধায় প্রকাশিত হওয়ার যোগ্যতাই রাখে না, মহাগ্রন্থ তো অনেক দূরের কথা, গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার আইনগত ভিত্তিই 'নারী' বইটির নেই।

www.pathagar.com

অবৈধ উৎস

ইসলাম ও মুসলমানের শত্রু (কাফির, মুশরিক, মুনাফিক, বে-দ্বীন, ইয়াহুদ, নাসারা ইত্যাদি), প্রকাশ্য গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি, স্মৃতিভ্রষ্ট বা অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি, ইসলামের ব্যাপারে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তি, বেহুদা কথা ও বেহুদা কাজে লিপ্ত বিতর্কিত ব্যক্তি এবং অন্যান্য সমভাবাপন্ন ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে মাসায়ালা বা ইসলামের কোন ব্যাপারে ফায়সালা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ বা হারাম। 'নারী' গ্রন্থের লেখক ইসলামী শরীয়াহ্‌র এই মৌলিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে রেফারেন্স হিসেবে যে সব গ্রন্থের সাহায্য তিনি নিয়েছেন তার সবই ইসলামের শত্রু শিবিরের ; মুসলমানরা যে সব গ্রন্থাবলী অকাট্য দলিল হিসেবে অনুসরণ করেন তার কোন কিছু লেখক অনুসরণ করেননি, বরং সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। আল-কোরআনের উদ্ধৃতি দিতে তিনি নির্ভরযোগ্য কোন অনুবাদককে গ্রহণ করেননি। আল-হাদীসের উদ্ধৃতি দিতেও তিনি সিহাহ্ সিত্তাহ বা অনুরূপ নির্ভরযোগ্য কোন গ্রন্থের সহায়তা খুব অল্পই নিয়েছেন। ফলতঃ তিনি নিজে যেমন পথভ্রষ্ট হয়েছেন তেমনি তাঁর পাঠককেও পথহারা করেছেন। ইসলামের ব্যাপারে জ্ঞান আহরণের জন্য ইসলামের মৌলিক গ্রন্থাবলী অনুসরণ করা তাঁর জন্য ফরজ ছিল। কিন্তু সে ফরজ আদায় না করার কারণে তাঁর জ্ঞানের চোখ যেমন খোলেনি তেমনি অস্থানিক ও বৈরী বিষয়াদিকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়ার কারণে তাঁর স্বাভাবিক দৃষ্টি শক্তিও তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। ইসলামের ব্যাপারে 'সঠিক জ্ঞান' বিতরণের জন্য তাঁর পুরো প্রকল্প তাই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, ইসলামের বিষয়ে তাঁর একটি কথাও সঠিক নয়, ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে 'নারী' গ্রন্থটি একটি শত্রুভাবাপন্ন মিথ্যা বা জাল দলিল মাত্র (এ কথা ক্রমান্বয়ে পাঠকের কাছে খোলাসা হবে)।

ইংরেজ জাতি সুদীর্ঘকাল এ দেশ কলোনী হিসেবে শাসন করেছে। সে শাসনের প্রভাব পড়েছে এ দেশের শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতির উপর। তারা আজ নেই, কিন্তু তাদের ও তাদের দোসরদের প্রভাব থেকে এ দেশের মানুষ আজও মুক্ত হয়নি, হতে পারেনি। ইসলামী হুকুম-আহকাম ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত 'শিক্ষিত' জনগোষ্ঠীকে বৃত্তি আর ডক্টরেট ডিগ্রির মোহজালে আটকে রেখে তারা দৃশ্যতঃ বিদায় হয়েছে ; কিন্তু সৃষ্টি করে গেছে শত শত মগজ-কলোনী। এই সব নব্য মগজ-

www.pathagar.com

কলোনী সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করার জাদু জানে। 'ডঃ' –এই জাদুকাঠি দিয়ে তারা পাঠককে ভুলিয়ে দেয়, মিডিয়াকে মোহমুগ্ধ করে ফেলে, ভাল-মন্দের জ্ঞান বিলুপ্ত করে দেয়। মানুষ ভুলে যায় যে, লোকটি যে বিষয়ের পিএইচডি শুধু সেই বিষয়েই তার কথা শতভাগ মেনে নেয়ার মত বা সত্য হওয়ার মত যুক্তি হয়ত থাকতে পারে, কিন্তু যে বিষয়ে সে কোন পড়া-শোনাই করেনি, বরং একেবারেই অজ্ঞ এবং অজ্ঞতার কারণেই বিষয়টার প্রতি যে লোক শত্রুভাবাপন্ন, ঠিক সেই বিষয়ে তার কথা মেনে নেয়া বা সত্য বলে ধরে নেয়া একেবারেই অযৌক্তিক।

হুমায়ুন আজাদ ডঃ। অর্থাৎ- ডঃ হুমায়ুন আজাদ। যতদূর জানি, তিনি ভাষাতত্ত্বের ডঃ। ইসলামের সাথে তার পড়া-শোনার দূরতম সম্পর্কও ছিল না। ব্যক্তিগত অধ্যয়ন অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে, কিন্তু যে বিষয় অধ্যয়নের জন্য যে পদ্ধতি ও বিষয়াদি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুনির্ধারিত, সে বিষয় ব্যক্তিগত অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও সে পদ্ধতি ও বিষয়াদি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। সবজান্তার মনোভাব নিয়ে সবকিছু হাসিল করা যেমন যায় না, তেমনি যুগ যুগ ধরে চলে আসা ঐতিহ্যকে এক ধাক্কায় নর্দমায় ফেলে দেয়াটাও সুস্থ মানসিকতা ও যথাযথ শিক্ষার পরিচায়ক বলে মেনে নেয়াও যুক্তিসঙ্গত হয় না। 'পড়েছি' বললেই পড়া হয় না। কী পড়েছি, কার লেখা পড়েছি, কেমন করে পড়েছি এসব প্রশ্নও জরুরী। টি পি হিউয়েজ বা ফাতেমা মেরিনিসসি ইসলামের ব্যাপারে কোন অথরিটি নয় ; বরং সর্বজন স্বীকৃত ইসলাম-বিদ্বেষী, শত্রু। শত্রুর কাছ থেকে কারও সম্পর্কে জানতে চাওয়া শুধু বোকামীই নয়, এক ধরনের শত্রুতাও।

হুমায়ুন আজাদ বোখারী শরীফ বা মুসলিম শরীফের মত অকাট্য কোন দলিল থেকে হাদীস খুব একটা উদ্ধৃত করেননি, তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন টি পি হিউয়েজের মত ইসলাম-বিদ্বেষী ধূর্ত পাদ্রীর বই থেকে। এই পাদ্রী লোকটি ইসলামের আদর্শ থেকে মুসলমানদের বিচ্যুত করার এবং দুনিয়ার বুকে ইসলামের অগ্রগতিকে ঠেকিয়ে দেয়ার সুস্পষ্ট মিশন নিয়ে এশিয়ায় এসেছিল বা প্রেরিত হয়েছিল। বৃটিশ আমলে ভারত ও আরব সফর করে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর পড়ালেখা করেছিল, যেমনটি গোয়েন্দারা করে থাকে শত্রু দেশের শত্রু ঘাঁটির ব্যাপারে। অতঃপর সত্য-মিথ্যায় জড়িয়ে লিখেছিল 'ডিকশনারী অব ইসলাম' এবং 'লাইফ অব মোহাম্মদ' নামক দু'খানি বই যা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ইসলামের উপরে অথরিটি বিবেচনায় প্রকাশ করেছে। দৃশ্যতঃ বই দু'খানিকে অথরিটি বলেই মনে হয়। অন্ততঃ অজ্ঞের কাছে এ দুটি বইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে জানা-শোনা লোকের কাছে এ দুটিকে খৃষ্ট

www.pathagar.com

জগতের জঘন্য মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। ইসলামের বিরুদ্ধে এও আর এক ধরনের ক্রুসেড। তথ্য-বিভ্রাট ঘটিয়ে মানুষকে ইসলাম বিমুখ করার অপকৌশল-সমৃদ্ধ পুস্তক-মিসাইল। খাঁটি আলীম ও বিদগ্ধ মুসলমান ছাড়া জাজ্বল্যমান মিথ্যার এমন মিসাইল অন্য কেউ চিনতেও পারবে না। বই দুটিতে পরিবেশিত তথ্যাবলীর কোন্‌টি মিথ্যা আর কোন্‌টি সত্য, ইসলামের সাথে বই দুটির কোথায় কতটা বিরুদ্ধবাদিতা তা ইসলামের উপরে যথেষ্ট পড়ালেখা ও জানাশোনা না থাকলে ঠাওর করা মুশকিল। বলা বাহুল্য যে, ডঃ হুমায়ুন আজাদের মত ইসলাম বিমুখ লোকের পক্ষে বই দুটোর অন্ধকার দিকগুলো ঠাওর করা সম্ভব ছিল না, কারণ অন্য কোন বিষয়ে যতবড় বিদ্যাধরই হোন না কেন, ইসলামের উপরে তাঁর অতটা পড়াশোনা ছিল না। টি পি হিউয়েজের পাতা ফাঁদ থেকে তাই বেরিয়ে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। সম্ভবতঃ তাঁর ধারণা ছিল যে, একমাত্র তিনিই সঠিক বইটির সন্ধান পেয়েছেন, দেশের আর সবাই বুঝি অন্ধকারে আছেন। ব্যাপারটা বাংলাদেশের পাঠকদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক, মর্মপীড়াদায়ক।

নওঅল এল সাদাওয়ি বা নওল সাদাবী এবং ফাতেমা মেরিনিসসির ব্যাপারটা আরও ভয়ঙ্কর।[২] আরব এলাকার এই দুই দ্বীনত্যাগী লেখক ইসলামের বিরুদ্ধে উদ্ভট অপপ্রচার এবং শরীয়াহ্‌ বিরুদ্ধ কাজ-কর্মের জন্য কুখ্যাত। ইসলামের শত্রু শিবিরের আশ্রয়পুষ্ট এবং আরববিশ্বে অত্যন্ত বিতর্কিত। আর ঠিক এঁদেরকেই ধরা হয়েছে ইসলাম আর আরবীয় মুসলমানদের ব্যাপারে নির্ভুল তথ্য প্রদানকারী নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে। ডঃ আজাদের মত একজন বুদ্ধিমান লেখক এমন একটি কাঁচা কাজ করেছেন ভাবতেও খারাপ লাগে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহোদয়ের এই অপরিণত কাজের জন্য আমাদের লজ্জিত হওয়ার কারণ নেই, খ্যাতির মঞ্জিলে দ্রুত পৌছার জন্য ভুল যানে আরোহণ করার অভ্যাস আমাদের লেখকদের প্রায় সবারই আয়ত্ত হয়ে আছে। বিশেষ করে ইসলামের ত্রুটি এবং মুসলমানদের দুশ্চরিত্র এই দুটি সস্তা বিষয়ের উপর একচোট ঝাড়তে পারলে নিঃসন্দেহে একজন বাঙালী বুদ্ধিজীবী হিসেবে দেশ-বিদেশে (বিশেষতঃ পশ্চিম বঙ্গে) যথেষ্ট সমাদর পাওয়া যাবে এমন একটি বাহারী ধারণা এ দেশে বহু দিন ধরেই প্রচলিত হয়ে আছে। কিন্তু ইসলাম আর মুসলমানদের উপর হুট করে কিছু ঝুটা

[২] যতদূর মনে পড়ে এ দু'জন লেখক মুসলমানদের বিরুদ্ধে উদ্ভট অপপ্রচারের জন্য নিজেদের দেশ থেকে বিতাড়িত এবং ইসলামের শত্রু শিবির কর্তৃক সমাদৃত। দাউদ হায়দার বা তসলীমা নাসরীনের মত নীচু মানের লেখক।

www.pathagar.com

কথা বলে দিলেই তো আর লোকে বিশ্বাস করবে না, তারা প্রমাণ চাইবে। সেই প্রমাণ দিতেই ফাতেমা মেরিনিসসি ; মহিলা ভদ্র কি অভদ্র, সভ্য কি অসভ্য, সত্যবাদিনী কি মিথ্যাবাদিনী এসব নিয়ে আজাদ সাহেবের কোন প্রশ্ন নেই, মহিলা মুসলমানদের বিপক্ষে কথা বলেছে স্টান্ডার্ড হিসেবে গ্রহণ করার জন্য এটুকুই তাঁর জন্য যথেষ্ট ছিল। মহিলার অভিযোগগুলো সত্য কিনা সেটা যাচাই করে দেখার তাঁর সুযোগ যেমন ছিল না, ইচ্ছাও তেমন হয়নি বলেই মনে হয়। হয়ত ভয় ছিল যে, যাচাই করতে গেলেই কথাগুলো মিথ্যা হয়ে যেতে পারে, ইসলাম-বিরুদ্ধ প্রকল্প তাতে মারা যেতে পারে। ডঃ আজাদ সঙ্গতঃ কারণেই সে রিস্ক নেননি। নওল সাদাবীর ব্যাপারটাও ওরকমই। এদেশের কোন বুদ্ধিজীবীই ইসলামের বিরুদ্ধে বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লিখিত বা উচ্চারিত কোন কথার সত্যতা যাচাইয়ের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না। তাঁদের বহু দিনের চর্চিত বুদ্ধিই তাঁদেরকে বলে দেয় যে, ইসলাম বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে-কোন কথাই স্বপ্রমাণিত হতে বাধ্য, কাজেই যাচাই করার আর প্রয়োজন নাই। তাঁরা বরং ইসলাম আর মুসলমানদের পক্ষে যায় এমন কোন কথা শুনলেই সেটার প্রমাণ চেয়ে বসেন। বই লেখার জন্য রেফারেন্স সংগ্রহের এমন উদ্ভট পদ্ধতি আর কোন দেশে অনুসৃত হয় কিনা তা জানা নেই। তবে এটা যে একটি নিষিদ্ধ ও ভুল পদ্ধতি সেটা অবশ্যই সবার জানা আছে।

নওল সাদাবী এবং ফাতেমা মেরিনিসসি আরবের মুসলমানদের ব্যাপারে যেসব কথা বলেছেন তা অবশ্যই প্রমাণসাপেক্ষ। লেখকের উচিত ছিল আরব দেশসমূহ ভ্রমণ করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে নিঃসন্দেহ হয়ে তারপর তা পাঠকের সামনে পরিবেশন করা। সেটা তিনি করেননি। গবেষণার নামে এ আচরণ নিতান্তই গর্হিত। মানুষ লেখকদের কাছ থেকে নিরপেক্ষ আচরণ আশা করে। সেটাই লেখকদের জন্য বৈধ, গ্রন্থস্বত্বের জন্য জরুরী।

নওল সাদাবী, ফাতেমা মেরিনিসসি বা টি পি হিউয়েজ ছাড়াও অন্য যে সব উৎস বা রেফারেন্স তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন তারও অধিকাংশই যুক্তি ও ন্যায়ের বিচারে অবৈধ। কালক্রমে পরবর্তী অধ্যায় সমূহে এ কথা প্রমাণিত হবে, ইনশাল্লাহ্ !

www.pathagar.com

অবতরণিকা এবং অহমিকা

জনাব হুমায়ুন আজাদ ভাষাবিদ, পন্ডিত এবং অকুতোভয়। প্রমাণ প্রয়োজন নেই, সবাই জানেন। কিন্তু তিনি যে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন এবং ভিন্নমত যে একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না সে কথা সবাই জানেন না। এটুকুর প্রমাণ আবশ্যক। তাই অবতরণিকা হতে উদ্ধৃত করছি ঃ ''সাথে দু-পাতার একটি সুপারিশ, যা করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দুটি বিশেষজ্ঞ – একটি দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের, আরেকটি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির পরিচালক ;- তারা এ-বিশাল বইটি থেকে ১৪টি বাক্য উদ্ধৃত করে পরামর্শ দিয়েছে : 'উপরোক্ত উদ্ধৃতি ও মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বইটি বাজেয়াপ্ত করার সুপারিশ করা যায়।' এতবড় বইটি পড়ার শক্তি ওই দুই মৌলবাদীর ছিল না ; তারা বইটি থেকে কয়েকটি বাক্য তুলে পরামর্শ দেয় নিষিদ্ধ করার।" ('নারী', তৃতীয় সংস্করণ, পঞ্চদশ মুদ্রণ, আগামী প্রকাশন, পৃঃ ১০)। মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধাবোধ কতটা কালো আর তীব্র হলে এমন গর্হিত শব্দাবলী কারও ব্যাপারে ব্যবহার করা যায় এবং নিজের প্রতি ধারণা কত উঁচু হলে অন্যকে এমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যায় তা গবেষণার বিষয় হয়েই থাকবে।

এদেশের প্রায় সব সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরই ধারণা যে, মৌলবাদীরা লেখা-পড়া জানে না। মৌলবাদীর ধারণাটাও অবশ্য বিচিত্র। যারা ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী অর্থাৎ মুসলমান, উগ্রপন্থী শিক্ষিত জনের কাছে তারাই মৌলবাদী। কিন্তু আমরা ১০০% নিশ্চিত যে, কথিত মৌলবাদীদের অনেকেই ভাল লেখা-পড়া জানেন, ডঃ হুমায়ুন আজাদ বা ডঃ আহমদ শরীফের মত শিক্ষিত লোকজনের সাথে যদি ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বা মাওলানা মোঃ আকরাম খাঁকে পাশাপাশি দাঁড় করানো যেত তাহলে লেখা-পড়ার দৌড় কার কত সেটা বোঝা যেত। মাদ্রাসায় পড়লে অথবা মুসলমান হলেই মানুষ অশিক্ষিত হয় এবং 'এতবড় বইটি পড়ার শক্তি' তাদের থাকে না এমন আজগুবী কথার জন্য আমাদের লজ্জিত হওয়ার যথার্থ কারণ অনুধাবন করা যেত। ডঃ আজাদের কথিত 'দুটি বিশেষজ্ঞ' কেন মাত্র ১৪টি বাক্য উদ্ধৃত করেছেন, কেন পূরা বইটি উদ্ধৃত করেননি, এমন কোন প্রশ্ন যদি একজন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রকে করা হয় তবে ওই ছাত্র হয়ত জবাব দেবে যে, যতটুকু দরকার ছিল ততটুকুই তাঁরা উদ্ধৃত করেছেন। তবে ওই ১৪টি বাক্য খুঁজে বের করতে যে তাঁদের পূরা বই পড়তে

www.pathagar.com

হয়েছে এতে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়। কিন্তু হুমায়ুন আজাদের সন্দেহ ছিল। শুধু সন্দেহ নয়, তিনি ১০০% নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁর বই পড়ার সামর্থ 'ওই দুটি মৌলবাদীর' ছিল না, নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহযোগী অধ্যাপক (বা অধ্যাপক)' ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের দু'জন সম্মানিত পরিচালক সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করেন তা বাস্তবিক অনুধাবন করার বিষয়। এরকম মনোভাবকে কেউ যদি উন্নাসিকতা বলেন তো বলতে পারেন। কিন্তু সমস্যাটা আর একটু গভীর। গোলাপকে কেউ যদি ধুতরা ফুল বলেন কিংবা গোল আলু বলে মনে করেন তাহলে বুঝতে হবে যে, তিনি ওই তিনটি বস্তুর একটাও চেনেন না। ডঃ আজাদ যেমন চেনেননি ওই 'দুটি বিশেষজ্ঞ'কে। এদেশের সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকজনের মধ্যে অনেকেই এরকম অবাস্তব জ্ঞানের অধিকারী। তাঁরা বুঝতেও পারেন না যে, তাঁদের চেয়ে বেশী লেখা-পড়া করার কারণেই কথিত মৌলবাদীরা ইসলামের সঠিক রূপটা ধরতে পেরেছেন যা তাঁরা নিজেরা পারেননি। সঠিক বস্তুটি সঠিকভাবে চিনতে না পারা গৌরবের বিষয় নয়, লজ্জার বিষয়।[৩]

ইসলামকে সঠিকভাবে চিনতে না পারার কারণেই ডঃ আজাদের কাছে মনে হয়েছে, "ধর্মানুভূতি এক বাজে কথা, এটা বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রমাণ সম্ভব নয় ('নারী', তৃতীয় সংস্করণ, পঞ্চদশ মুদ্রণ, আগামী প্রকাশন, পৃঃ ১১)।" কিন্তু ডঃ আজাদের এ বাক্যের দুটা অংশের একটাও সঠিক নয়। ধর্মানুভূতিও বাজে কথা নয়, বস্তুনিষ্ঠভাবে সেটা প্রমাণ করাও সম্ভব। প্রমাণ করার মত যার শক্তি আছে তার পক্ষেই ওটা সম্ভব, শক্তিহীনের জন্য অসম্ভব। বাংলার লোককাহিনীর নায়িকা রূপবান খেয়া নৌকার মাঝিকে দিয়েছিল এক মাণিক্য, কিন্তু মাঝির দরকার ছিল মাত্র এক পয়সা। সে মাণিক্য চেনে না, তাই হতভাগা সাত রাজার ধন এক মাণিক্যের ঠাঁই হয়েছে নদীর জলে, রূপবানের ভাগ্যে জুটেছে প্রশংসার বদলে তিরস্কার, গালাগালি। হেদায়েত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তির পক্ষেই ইসলামের সঠিক রূপ দর্শন করা সম্ভব, অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়। বাঁকা পথ অন্বেষণকারীর রাস্তা আল্লাহ্ পাক চিরদিনের জন্য বাঁকিয়ে দেন, আল-কোরআনের এই বাণী যে সত্য তার প্রমাণ উপস্থিত এই 'নারী' গ্রন্থটি যার প্রায় প্রতি

[৩] এই অনুচ্ছেদ পড়ে কেউ যেন মনে করে না বসেন যে, লেখক বুঝি মাদ্রাসা পড়া লোক। দুঃখিত, সে সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। তিনিও ডঃ আজাদের মতই সাহিত্যের ছাত্র। উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র ছিলেন, ইনিও ওই একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের ছাত্র ছিলেন। ওনার সাবসিডিয়ারী ছিল ইংরেজী, এঁর সাবসিডিয়ারী ছিল বাংলা। উনি ইসলামের উপরে পড়ালেখা করেননি, ইঁনি কম হলেও করেছেন। পার্থক্যটা সেখানেই।

www.pathagar.com

পংক্তিতেই মিথ্যার সর্পরূপ মুখব্যাদান করে আছে, অথচ লেখক-প্রকাশক বা এর স্তাবকদের কারও চোখেই তা ধরা পড়ছে না। ইসলাম যে সত্য, ধর্মপ্রাণ মুসলমানের ধর্মানুভূতি যে বাজে কথা নয়, বরং এর প্রতিটি বিষয় যে বস্তুনিষ্ঠভাবেই প্রমাণযোগ্য তা এখানেই প্রমাণিত। আরও কোনো প্রমাণ চাইলে অবশ্যই আরও প্রমাণ দেয়া হবে। পরবর্তী চ্যাপ্টারগুলোতে ক্রমান্বয়ে সে সব প্রমাণ আসতে থাকবে, ধৈর্য সহকারে সে জন্য অপেক্ষা করতে হবে। যথাযোগ্য স্থানেই যথাযোগ্য প্রমাণ সংযুক্ত হবে, ইনশাল্লাহ্।

'নারী' গ্রন্থে যে শুধু ধর্মকেই আঘাত করা হয়েছে তা নয়। আঘাত করা হয়েছে রাষ্ট্রকেও। যেমন ঃ ''রাষ্ট্র বিশ্বাস করতে পারে ভূতপ্রেতে, কিন্তু কোন মননশীল মানুষের পক্ষে তা মেনে নেয়া অসম্ভব। পৃথিবী এখন যেসব বিশ্বাস পোষণ করে, তার সবই ভুল, কেননা সেগুলো পৌরাণিক; রাষ্ট্রগুলো আজো আমাদের পৌরাণিক জগতে বাস করতে বাধ্য করে। আমি পৌরাণিক সংস্কৃতি ও অসভ্যতা থেকে বেরিয়ে পড়তে চাই; নারীর পাতায় পাতায় সেই অভিলাষ রয়েছে ('নারী', তৃতীয় সংস্করণ, পঞ্চদশ মুদ্রণ, আগামী প্রকাশন, পৃঃ ১১)।" অবাক হওয়ার মত কথা। রাষ্ট্র আবার কবে ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করল ? পৌরাণিক বিশ্বাসই বা রাষ্ট্রের সংবিধান বা আইন-কানুনের মাঝে কোথায় ? রাষ্ট্র আবার কবে কাকে পৌরাণিক জগতে বাস করতে বাধ্য করল ? রাষ্ট্র আবার কবে, কখন, কিভাবে পৌরাণিক সংস্কৃতি ও অসভ্যতার চর্চা করল যা থেকে ডঃ আজাদ বেরিয়ে পড়তে চান ? এসব প্রশ্নের জবাব রাষ্ট্র অবশ্যই চাইতে পারে। কিন্তু চাইবে কিনা সেটা রাষ্ট্রই ভাল বলতে পারবে।

'পৃথিবী এখন যেসব বিশ্বাস পোষণ করে তার সবই ভুল', আজাদ সাহেবের একথা নিতান্তই বালসুলভ। পৃথিবী বিশ্বাস করে মানে পৃথিবীর মানুষ বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের মাঝে তো অনেক কিছুই আছে যা যুগ যুগ ধরে প্রমাণিত। যেমন 'মানুষ মরণশীল' কথাটি। সারা পৃথিবীর সব মানুষই এটা বিশ্বাস করে, কথিত পৌরাণিক যুগেও বিশ্বাস করত এবং এখনো বিশ্বাসটি নির্ভুল। যুদ্ধ অশান্তি সৃষ্টি করে। এটাও পৃথিবীর সব মানুষ বিশ্বাস করে, যারা যুদ্ধ করে তারাও বিশ্বাস করে (যদিও উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে তারা যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়)। এ বিশ্বাসের মাঝেও কোন ভুল নেই। হুমায়ুন আজাদের যে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সে ব্যাপারেও পৃথিবীর মানুষের একটা সুস্পষ্ট বিশ্বাস আছে। সবাই বিশ্বাস করে যে, নর-নারীর মাঝে অধিকাংশ মৌলিক বিষয়ে আত্মিক ও সাত্ত্বিক পার্থক্য বিদ্যমান। এ বিশ্বাসের মাঝেও কোন ভুল নেই, কারণ এসব পার্থক্য দৃশ্যমান ও প্রাকৃতিক, যা অদৃশ্য তাও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত।

www.pathagar.com

এই সব বাস্তব ও প্রত্যক্ষ বিষয় অস্বীকার করা নিতান্তই ধান্দাবাজী, মিথ্যাচার এবং এক ধরনের অপরাধ যা সমাজে নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করছে আর পরস্পরকে পরস্পরের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করছে, বিরুদ্ধবাদিতায় লিপ্ত করছে। কিন্তু ডক্টর সাহেব এসব যৌক্তিক ও বাস্তব বিষয় বিবেচনায় না এনে পৃথিবীর তাবৎ বিশ্বাসকে এক কথায় উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন 'কেননা সেগুলো পৌরাণিক' বলে। কিন্তু যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার করে দেখলে তাঁর ওই কথা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমতঃ পৃথিবীর সব বিশ্বাস পৌরাণিক নয়; দ্বিতীয়তঃ সব পৌরাণিক বিষয়ও মিথ্যা নয় (যেমন ট্রয় নগরীর ঘটনা) এবং তৃতীয়তঃ দুনিয়ার অধিকাংশ বিশ্বাসের মূলেই যুক্তি ও জ্ঞান আছে যার সম্মিলিত নাম বিজ্ঞান। দুগ্ধপোষ্য শিশু মাকেই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বলে বিশ্বাস করে (যে কারণে সে মাকে আকঁড়ে থাকে), পিতাকে সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় বলে বিশ্বাস করে (যে কারণে সে বিপদ টের পেলেই মায়ের কোল থেকে পিতার কোলে ঝাঁপ দেয়) এবং একা হলেই সে বিপদে পড়বে বলে বিশ্বাস করে (যে কারণে নিজেকে একা আবিষ্কার করলেই সে সন্ত্রস্ত হয়ে কান্না জুড়ে দেয়)। শিশুর এই তিনটা বিশ্বাসের মাঝে একটাতেও কোন ভুল নেই। এর সাথে বরং জড়িয়ে আছে শিশুর বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্জাত প্রাথমিক জ্ঞান এবং সহজাত প্রেরণা যা আসলে যুক্তি ; অকাট্য বিজ্ঞান। এ বিজ্ঞান নতুন কিছু নয়, বরং পুরাতন, একেবারেই পুরাতন। ডঃ আজাদ যাকে পৌরাণিক বলেছেন তার চেয়েও পুরাতন। কিন্তু সত্য আর নিত্য। এ সত্য অতীত হয় না। এ সত্যের বিলয় ঘটে না।

'নারী'র অবতরণিকা পড়ে মনে হয়েছে যে, লেখক আসলে বিশ্বাস বলতে ধর্মীয় বিশ্বাস বুঝাতে চাচ্ছেন। সে কারণেই বিশ্বাসগুলোকে পৌরাণিক বলার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু দুনিয়ার সব ধর্মে তো পৌরাণিক বিশ্বাস নেই। ইসলামে পৌরাণিকতা কোথায় ? ইসলামের আবার পুরাণ বলে কিছু আছে নাকি ? আমরা তো এরকম কোন পুরাণের নাম কখনও শুনিনি। ইসলাম তো দেব-দেবীতেই বিশ্বাস করে না, তার আবার পুরাণ কী ? ইসলামের কাজই তো সব পুরাণকে অস্বীকার করে যুক্তি ও বাস্তবভিত্তিক বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয় ঘটিয়ে সুন্দর ও সুশৃংখল জীবন পরিচালনা করা। অযৌক্তিক কোন অন্ধ বিশ্বাস ইসলামে নাই। ইসলামের প্রত্যেকটা বিষয় ও বিধানের পশ্চাতে বিজ্ঞান-সম্মত বাস্তবভিত্তিক যুক্তি আছে। ইসলামের কোন্ কোন্ বিষয় অযৌক্তিক বা অবাস্তব বলে লেখক মনে করেন তার কোন তালিকা তিনি দেননি। ইসলামের কোন বিষয় তিনি অযৌক্তিক বা অবাস্তব বলে প্রমাণ করতেও পারেননি। ইসলামে পৌরাণিক বিশ্বাস

www.pathagar.com

থাকার মত কোন কিছুর উল্লেখ করতেও তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। অথচ ঢালাওভাবে পুরাণভিত্তিক ধর্মগুলোর সাথে ইসলামকেও এক কাতারে দাঁড় করিয়ে আবেগঘন বক্তব্যের মাধ্যমে পাঠকদের মনে এক ধরনের বিতৃষ্ণা জন্মানোর অপচেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য যে, ইসলামের সাথে অন্যান্য ধর্মের পার্থক্য না বোঝার কারণেই লেখক এমনভাবে তাঁর রাস্তা হারিয়েছেন যা বাস্তবিক দুঃখজনক। এতবড় একটা বিষয়ের উপর লিখতে গিয়ে আর একটু সতর্ক, বিবেচক ও জ্ঞানবান হওয়া তাঁর উচিত ছিল। অন্ধভাবে কোন লেখক বা কোন লেখক গোষ্ঠীকে অনুসরণ ও অনুকরণ করা কোন শিক্ষিত লোকেরই উচিত নয়। ধর্মের বিরুদ্ধে ইউরোপের অনেক লেখকই অনেক যুক্তিসঙ্গত কথা বলেছেন, কিন্তু তাঁরাও কেউ ইসলামের কোন বিষয়কে যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার করে মিথ্যা প্রমাণ করতে পারেননি। অবিশ্বাস করা এক কথা, মিথ্যা প্রমাণ করা আর এক কথা। কোন বিষয় প্রমাণ না করে সেটাকে স্বীকার বা অস্বীকার করা অন্ধ বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়। এরকম অন্ধ বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য নয়। যে যত বড় দার্শনিক বা লেখকই হোন না কেন যুক্তিশাস্ত্রের বাইরে শুধু আবেগনির্ভর বক্তব্য কারও কাছ থেকেই কাম্য নয়। হুমায়ুন আজাদকে আগে প্রমাণ করতে হবে যে, তিনি যা বলছেন তা সত্য। সেটা তিনি যতক্ষণ না পারছেন ততক্ষণ তিনি পাঠকের দরবারে ধর্মদ্রোহী, রাষ্ট্রদ্রোহী এবং মিথ্যা বলার অপরাধে অপরাধী। শুধু অতীত হয়ে গেছে কিংবা বহু পুরাতন তাই পরিত্যাজ্য, এই ভ্রান্ত যুক্তিতে কেউ সত্য থেকে বিচ্যুত হবে না। কারণ সত্যের পরিবর্তন হয় না বলে এ দুনিয়ায় সত্যই সবচেয়ে পুরাতন বস্তু। হুমায়ুন আজাদ এবং তাঁর অনুগামীদের বুঝতে হবে যে, ইসলাম শাশ্বত সত্যের আধার, চিরন্তন জীবন ব্যবস্থার ধারক-বাহক, মিথ্যার অবলোপনকারী। সে জন্যই সে সবচেয়ে পুরাতন হওয়া সত্ত্বেও সবার উপরে সে টিকে আছে এবং সবার পরেও সে টিকে থাকবে। অসত্যের পরিবর্তন হয়, সত্যের পরিবর্তন হয় না। বিভ্রান্তিবশতঃ মানুষ সত্যের চর্চা বন্ধ করতে পারে, কিন্তু সত্য চিরকাল অবিকৃতই থেকে যায়। মাটির নীচে রাখলেও স্বর্ণে কখনো মরিচা ধরে না।

এই পৃথিবীতে মানুষের বসবাস নতুন কিছু নয়। বহু বহু বহু যুগ ধরে মানুষ এখানে বাস করছে। অতীতের সবকিছুই যদি মানুষের ভুল হতো তাহলে পৃথিবীতে সে এতদিন টিকে থাকতে পারত না। বিলুপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু নব্য মানুষদের অনেকেই এই সহজ সত্যটি বোঝে না। তারা মনে করে আগেকার সবকিছুই ভুল ছিল বা প্রচলিত সবকিছুই বুঝি ভুল। তাদের শিশুর মত আব্দার সবকিছু পরিবর্তন করতে হবে, সবকিছু নতুন

www.pathagar.com

হতে হবে। এই পরিবর্তনের নেশা বা আগ্রহ এমন একটা পর্যায়ে পৌছেছে যে, এটাকে বাতিক বা রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা চলে। যেমনঃ ''অতীত হচ্ছে অতীত;-অতীতকে জানতে হবে, কিন্তু অতীতের বিধানে চলা হাস্যকর ও শোককর। ... মানুষ কতটা মুক্ত তার একটি মানদন্ড হচ্ছে সে অতীত হতে কতটা মুক্ত ('নারী', তৃতীয় সংস্করণ, পঞ্চদশ মুদ্রণ, আগামী প্রকাশন, পৃঃ ১২)।" কেন অতীত হতে মুক্ত হতে হবে, কেন অতীতের সাথে কোন যোগসূত্র রাখা যাবে না, কেন অতীতের সব বিধান বাতিল করে দিতে হবে তার গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা 'নারী' গ্রন্থে নাই যদিও পরিবর্তনের জন্য হাঁকডাক আছে প্রচুর। কি আজব পাগলামী ! অতীতকে জানতে হবে বলে স্বীকার করা হচ্ছে, আবার অতীতকে মানা যাবে না বলে শিশুর বায়নাও চলছে ! তাহলে অতীতকে জানতেই বা হবে কেন ? আসলে অতীত মা-বাবার মত, বর্তমান অতীতের সন্তান, ভবিষ্যৎ বর্তমানের সন্তান – কাউকে ছেড়ে কারও চলে না। মানব-সভ্যতার অপর নাম ধারাবাহিকতা, যদিও নব্যতা প্রতিনিয়তই ঘটতে থাকে। অতীতের মন্দকে অবদমিত করে, ভালকে সংরক্ষণ করে, বর্তমানের নব্যতাকে আলিঙ্গন করে এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করেই মানবজাতিকে টিকে থাকতে হয়েছে, টিকে থাকতে হবে। বর্তমানের নব্যতা ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা বস্তুতঃ অতীতের গর্ভেই লুকিয়ে ছিল। অতীতের সবকিছুকে এক ধাক্কায় বাতিল করে দিলে বর্তমানও নষ্ট হয়ে যাবে, ভবিষ্যত বলে আর কিছু থাকবেই না। অতীত বিধান বাতিলের দেশ বাংলাদেশে এখন শিক্ষকরা ছাত্রদের হাতে পিটুনি খায় যা জাপান বা চীনে আশাই করা যায় না, মধ্য প্রাচ্যের কোন দেশে স্বপ্নেও এমনটি ঘটার সম্ভাবনা নাই। কারণ ওসব দেশ ছাত্র-শিক্ষকের 'পৌরাণিক' যুগের সম্পর্ক আজও বাতিল করেনি। কোন মুসলিম দেশে রক্তের সম্পর্কের মাঝে পারস্পরিক হত্যাকান্ড শূন্যের কোঠায়, কিন্তু বাংলাদেশে ঘটছে অহরহ, কারণ ওরা অতীতকে বহাল রেখেছে আর আমরা নতুনত্বের নেশায় সবকিছু পরিবর্তন করে ফেলেছি। এশিয়ার আর কোন দেশে মুরুব্বীরা কনিষ্ঠদের গালমন্দও শোনে না, তাদের হাতে নিগৃহীতও হয় না; কিন্তু বাংলাদেশে কনিষ্ঠের মুখ আর হাত থেকে কোন মুরুব্বীই নিরাপদ নয়। পনের বছরের ছেলেটি ষাট বছরের বৃদ্ধের গলা ঠেসে ধরে আঙ্কেল বলে সম্বোধন করেই। অতীতে এসব কখনও ঘটতো না, ঘটলেও পরিবার ও সমাজ-বিধানের আওতায় বেয়াদব কনিষ্ঠ কঠোর শাস্তি পেত। কিন্তু এখন সবকিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে। অতীতের আদব-কায়দার চালিকা শক্তি দ্বীন-ধর্মকে আজাদ সাহেবদের মত পরিবর্তনকামীরা বাতিল করে দিয়েছেন। দ্বীন-ধর্মের কিতাবগুলো এখন আর কনিষ্ঠরা ছোঁয় না, কিন্তু আজাদ সাহেবদের ল্যাংটা বইগুলো

www.pathagar.com

তারা পড়তে ভোলে না, ধর্ষণ-পীড়িত সিনেমা দেখতেও তারা কামাই দেয় না, পরিবর্তনবাদীদের পরামর্শ মতো সবদেখামু পোশাক পরে সমাজ নোংরা করতেও কারও অন্তর কাঁপে না। ফল যা হবার তা হচ্ছে। ডঃ আজাদ আফসোস করেছেন, "এখনকার বাংলাদেশ ধর্ষণপ্রবণ ('নারী', তৃতীয় সংস্করণ, পঞ্চদশ মুদ্রণ, আগামী প্রকাশন, পৃঃ ১৩)।" সেটা আমরাও দেখি আর চোখের জল ফেলি। কিন্তু কার দোষে ? পরিবর্তনের দোষে। পরিবর্তনবাদীদের অত্যুৎসাহ-দোষে, কান্ডজ্ঞানের অভাবে। আগেকার দিনে বদমাস চোর-ডাকাতও মেয়েদের গায়ে হাত দিত না, আল্লাহ্‌র গজবের ভয় ছিল। কিন্তু এখনকার কুশিক্ষার প্রভাবে মানুষ আর আল্লাহ্‌কে ভয় করে না, অনেকে আল্লাহ্‌কে স্বীকারই করে না। এরকম অপগন্ড সমাজে নারী নিরাপদ থাকবে কি করে ? সবকিছুর একটা সীমা আছে যা লঙ্ঘন করলেই বিপদ। পরিবর্তনবাদীরা এটুকু বোঝে না। দুনিয়ার সবকিছু যে পরিবর্তন করা যায় না, সত্যের যে ভিন্ন রূপ হয় না, অনেক কিছুই যে পুরাতন হলেও মানবজাতির জন্য কল্যাণকর সে কথা তারা বোঝে না, বুঝতেও চায় না। সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়, দশ লক্ষ বছর পূর্বেও হতো, যতদিন পৃথিবী থাকবে আল্লাহ্ চাহেন তো ততদিনই হতে থাকবে। গাছের পাতার রং সবুজ। বাক্যটি চিরকালীন সত্য। কেউ ওটা পাল্টাতে চাইলে সে ভুল করবে। রঙের নামটা অবশ্য পাল্টানো যায়, কিন্তু তাতে লোকসান হবে। অন্যান্য সবুজ বস্তুর রঙের নামও পাল্টাতে হবে। ওটার পরিবর্তে যে রঙের নাম গ্রহণ করা হবে সেই রঙের সব বস্তুর রঙের নামও পাল্টাতে হবে। নইলে সবকিছু গোলমাল হয়ে যাবে, একাকার হয়ে যাবে। লাল গোলাপ আর সবুজ পাতার রঙের নাম একটি হলে চলবে না। এসব পাল্টাতে যাওয়া মানে ঝামেলার বাক্স উন্মুক্ত করা। লাভের চেয়ে লোকসানের মাত্রাই তাতে বহু গুণে বৃদ্ধি পাবে। সত্যের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নাই, সুন্দরের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নাই, সুবিধার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নাই, এগুলো চিরকালীন। প্রতিবন্ধী না হলে সবার জন্যই সমান। সত্য ও সুন্দরের বিষয়টায় সবাই একমত হবেন সন্দেহ নাই; তবে সুবিধার ক্ষেত্রেও দ্বিমতের অবকাশ নেই। প্রতিবন্ধী বা বাঁহাতি না হলে ডান হাতে কাজ করতে সবার সুবিধা, কোন যুগেই এর কোন ব্যতিক্রম নেই। নারী-পুরুষের নিজস্ব সম্পর্কের কতগুলো সুবিধাজনক নিয়ম, পদ্ধতি ও অবস্থান আছে যা সব যুগেই সমান, কোন ব্যতিক্রম নেই। ব্যতিক্রমী কিছু করতে চাইলে সম্পর্ক বিস্বাদ ও অস্বাভাবিক হয়ে যাবে, উভয়ের জন্যই ক্ষতির কারণ হবে। সব সমাজে একটা নির্দিষ্ট বয়সে ভাই-বোন আলাদা ঘুমায়। এটা চিরকালীন প্রথা। পুরাতন হলেও এ ব্যবস্থা সম্পর্কের স্বাভাবিকতার জন্য সুবিধাজনক। অন্যথায় ঝামেলা বাড়বে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে

www.pathagar.com

উভয়েই। ভাইয়ের চেয়ে বোন ক্ষতিগ্রস্ত হবে বেশী, মূল্যবোধের কারণে নয়, প্রাকৃতিক কারণে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক রক্ষারও কতগুলো বিশেষ পদ্ধতি আছে যার ব্যতিক্রম ঘটলে উভয়েই পরস্পরের প্রতি বিরক্ত ও বিতৃষ্ণ হয়ে উঠবে, সংসার টিকবে না। নতুনের মোহে নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করতে গেলে বিরাগ আসবে, উভয়ের দেহে-মনে ব্যথা-বেদনা দেখা দেবে যার প্রথম শিকার হবে নারী, এটাও প্রাকৃতিক কারণেই। মানুষের প্রাথমিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে প্রাকৃতিক কারণে, সমাজ গড়ে ওঠে প্রাথমিক মূল্যবোধের কারণে, সেকেন্ডারী মূল্যবোধ গড়ে ওঠে সামাজিক কারণে। মূল্যবোধ পাল্টানোর দরকার হলে সেকেন্ডারী মূল্যবোধই পাল্টানো যায়, প্রাথমিক মূল্যবোধ পাল্টানো যায় না, যেহেতু প্রাকৃতিক বিধান পাল্টানো সম্ভব নয়। অনেক প্রথার পশ্চাতে রয়েছে প্রাথমিক মূল্যবোধ যা প্রাকৃতিক বিধান দ্বারা পরিচালিত। সব প্রথা খারাপও নয়। অনেক প্রথার পশ্চাতেই কাজ করে যুক্তি এবং অনেক প্রথাই সমাজে ও মানবজীবনে কল্যাণের ধারক-বাহক হিসেবে কাজ করে। এই সোজা কথাটি না বুঝে কেউ যদি সব প্রথা পাল্টানোর জন্য গোঁ ধরে বসে তবে তাঁকে নিরস্ত করতে হবে। কিন্তু এই মগজ-কলোনীর দেশে কেউ কাউকে নিরস্ত করতে পারে না, সমস্যার আবর্ত সেখানেই।

সভ্য জগতে বহু যুগের সাধনায় নারী-পুরুষের যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বা ইসলামী বিশ্বে স্রষ্টা কর্তৃক নারী-পুরুষের সম্পর্কের যে নিত্য বলয় নির্দেশ করা হয়েছে তার মৌলিক ভিত্তি হলো প্রয়োজন। প্রয়োজনের তাগিদে নারী-পুরষ তাদের নিজস্ব বলয় লাভ করেছে। কিন্তু কিছু কিছু অবুঝ মানুষ এ ব্যবস্থাকে নির্দেশ করেছে পুরুষতন্ত্র হিসেবে। তাদের মত করে ব্যাপারটাকে যদি তন্ত্রই বলতে হয় তবে তা প্রয়োজনতন্ত্র, পুরুষতন্ত্র নয়। একজন সুস্থ-সবল-সক্ষম নারী প্রায় সারা বছরই হয় গর্ভবতী নয় তো সন্তানবতী থাকে।[৪] নারীশিশু আর বৃদ্ধা নারী ব্যতিক্রম, কর্মজগতে যাদের কোন ভূমিকা রাখার কোন সামর্থ নেই। গর্ভবতী ও সন্তানবতী নারীরাও কর্মময় দুনিয়ার কঠিন বাস্তবতার সামনে অসহায় এবং উভয়ের জন্যই প্রয়োজন ছায়া, মায়া, বেষ্টনী, খাদ্য, পানীয় আর বিছানা। সর্বোপরি নিরাপত্তা – চোর, ডাকাত, লম্পট, দাস-ব্যবসায়ী, বেশ্যাখানার মালিক, দালাল, পাচারকারী, কিডনী-লিভার ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গুপ্ত ব্যবসায়ী, পাড়ার 'রোমিও', সর্বপ্রেমিক মুক্ত চিন্তাবিদ, নারীবাদী ধূর্ত পুরুষ, হিংস্র প্রাণী

[৪] কৃত্রিম পদ্ধতির কথা বলা হয়নি। কৃত্রিম বিষয়াদি স্থায়ী কোন ব্যাপার নয়। এসব পূর্বে ছিল না, ভবিষ্যতেও হয়ত থাকবে না।

www.pathagar.com

এবং এই জাতীয় আরও অনেকের কাছ থেকেই যে-কোন সোমত্ত নারীর নিরাপত্তা প্রয়োজন। সে কারণেই তার প্রয়োজন ঘরের। নিষ্পাপ-নিবুঝ হরিণীর মতই অনেক যুবতী নারী এটা বোঝে না। কিন্তু তাড়া খেয়ে সে যেখানে গিয়ে আশ্রয়ের জন্য ঢোকে সেটা ঘর, যা তৈরী করেছে পুরুষ – তারই পিতা, স্বামী অথবা ভাই। তার পক্ষে লাঠি, দা বা বন্দুক নিয়ে যে মানুষটি ঘর থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রতিপক্ষের সামনে দাঁড়ায় সেও পুরুষ। নারী-পুরুষের সম্পর্কের এই প্রাকৃতিক দিকটা যে অস্বীকার করে সে বোকা। একে যে পুরুষতন্ত্র বলে সেও বোকা। কিন্তু চক্ষুষ্মান যে-কোন মানুষই নারী-পুরুষের এই সহজ সম্পর্কটি বুঝতে পারে এবং ইসলামের সকল বিধি-ব্যবস্থার অর্থও তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। নিজের এবং নারীর প্রয়োজনেই পুরুষ চিরকাল ঘরের বাইরে কাজ করে, নারী যেমন প্রয়োজনের তাগিদেই ঠাঁই করে ভেতরে, সামলায় পুরুষের গড়া ঘর। দুজনের শরীর আলাদা, মন আলাদা, সামর্থ আলাদা, প্রয়োজনও আলাদা। এই সহজ সত্যকে অস্বীকার করা, নারী-পুরুষকে এক রকম করে দেখা নিতান্তই অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক। 'আমিও পুরুষের মতো হবো' এই উদ্ভট্টা বায়নাক্কা[৫] বেবুঝ কিশোরীর, যার কোন বাস্তব জ্ঞান হয়নি, সবকিছুতেই যার সীমাহীন কৌতুহল, কিন্তু সামর্থ নাই তা বাস্তবায়নের, থাকলে আর বায়না ধরতো না, বরং পুরুষ হয়েই যেত, কাউকে জিজ্ঞাসাও করতো না, তবে ধরা পড়ার আগ পর্যন্ত তার বান্ধবীদের জন্য টক-ঝাল-মিষ্টি স্বাদের একটা বেপরোয়া উপদ্রব হয়ে উঠত। এই বেবুঝ জিদ আর বায়নার পশ্চাতে সারা দুনিয়ার অনেকেই আজ বেহুদা কসরতে সময় ও অর্থ ব্যয় করছে। এতে শুধু পুরুষের উপর নয়, বরং নারীর উপরও অন্যায় করা হচ্ছে। একের কাজও অন্যকে দিয়ে চলে না, একের অবস্থাও অন্যের উপর চাপানো যায় না। এই সোজা কথাটা যে-কোন সভ্য মানুষ বোঝেন। মুসলমানরা বোঝেন সবার আগে। কারণ সম্পর্কের এই আসল ভেদ মুসলমান নরনারী জীবনের শুরুতেই জেনে নেয়, যে কারণে বাস্তব ও ধর্মীয় জ্ঞান আছে এমন কোন নারী-পুরুষের মাঝে উদ্ভট্টা বায়নাক্কার কোন নারীবাদী খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাস্তব জ্ঞান সম্পন্ন কোন মানুষই ইসলামের কোন ব্যাপারে কোন খুঁত খুঁজে পাবে না। ডঃ আজাদ এসব বিধি-ব্যবস্থাকে 'মধ্যযুগীয় প্রথা' বলে নিন্দা জানিয়ে নিজের বিবেক-বুদ্ধির উপরই বরং অন্যায় করেছেন।

---

[৫] উদ্ভট্টা বায়নাক্কা শব্দ দুটি যেমন এ কৌতুহলও ঠিক তেমন। প্রথম শব্দটির মানে কোন অভিধানে পাওয়া যাবে না।

পাওয়ার দরকারও নেই। যা উদ্ভট তার অর্থ খুঁজতে না যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

www.pathagar.com

ইসলামই সনাতন দ্বীন[৬]

ডঃ আজাদ যতই বলুন না কেন, ধর্ম হিসেবে ইসলাম কিন্তু কনিষ্ঠ নয়। তিনি 'নারী' এবং 'আমার অবিশ্বাস' নামক দুটো গ্রন্থেই ইসলামকে কনিষ্ঠ ধর্ম হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁর এ 'জ্ঞান' অমুসলিমদের কাছ থেকে নেয়া, যারা ইসলাম সম্পর্কে তেমন কিছু জানেও না, মানেও না। যদি জানতই তাহলে ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের মাঝে পার্থক্যটাও বুঝত, সব একাকার করে ফেলত না। আর মানলে তো তারাও মুসলমান হয়েই যেত, দুনিয়া জুড়ে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়াত না। ইসলাম সম্পর্কে যার জ্ঞান আছে সে-ই ইসলামকে মানে, যার জ্ঞান নেই সে বেহুদা কথায় আর অসংলগ্ন কাজে নিজের জীবনপাত করে, অথচ মনে করে সে সঠিক পথে আছে। আসলে ইসলাম কনিষ্ঠ নয়, বরং সবচেয়ে পুরাতন। মানুষের ইতিহাস আর ইসলামের ইতিহাস সমান বয়সী। হযরত আদম (আঃ) যেমন প্রথম মানুষ তেমনি তিনি মানুষের প্রথম নবী। তাঁর অনেক পূর্ব হতেই পৃথিবীতে জ্বীন জাতি বাস করত। তাদের ধর্মও ছিল এক আল্লাহ্‌য় বিশ্বাস এবং এক আল্লাহ্‌র ইবাদত। অর্থাৎ - ইসলাম। তারা বার বার ধর্মচ্যুত হওয়ার কারণেই আল্লাহ্ বার বার তাদেরকে ধ্বংস করেছেন এবং বার বার সৃষ্টি করেছেন। ইবলিশ সে জ্বীন জাতিরই বংশধর।

হযরত আদম (আঃ) পৃথিবীতে আগমনের পর তাঁর বংশধরদের মাঝে ইবলিশের প্রভাব পড়তে শুরু করে। তাঁরা আল্লাহ্‌র বিধান অমান্য করতে শুরু করে। অতঃপর আল্লাহ্ হযরত আদম (আঃ) এর উপর কিতাব নাজিল করে ধর্মের ছবক দান করেন। তাঁর উপর এক এক করে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সর্বমোট দশখানা কিতাব আল্লাহ্ নাজিল করেন। এগুলো ইসলামেরই গ্রন্থ ; মানুষের হাতে বিকৃতি লাভ করে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে, আজ আর ওগুলো ইসলামের কিতাব বলে চেনার উপায় নেই। তথাপি ওগুলোর মাঝে এখনও অনেক আয়াত অবশিষ্ট আছে যার মাঝে ইসলামী আকিদার বিষয়গুলো সহজেই চেনা যায়। কাজেই যে সব মানুষ হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর সময় থেকে ইসলাম শুরু হয়েছে বলে মনে করেন তারা সঠিক ধারণা পোষণ করেন না। এই বেঠিক ধারণার দলটিই বলে থাকেন যে, ইসলাম সর্ব-কনিষ্ঠ ধর্ম। অনেকে আবার

[৬] এ সনাতন মানে হিন্দু ধর্ম নয়। এ 'সনাতন' একটি সাধারণ শব্দ ; অর্থ চিরায়ত বা চিরন্তন।

www.pathagar.com

ইসলাম-পূর্ববর্তী যুগের কথাও বলেন; কিন্তু ইসলাম-পূর্ববর্তী যুগ বলে আসলে কিছু নাই, কোন কালেই কিছু ছিল না। ইসলাম শুরুই হয়েছে প্রথম মানব-মানবী দিয়ে, তারও আগে এটি জ্বীন জাতির দ্বীন ছিল, এখনও আছে; এর আবার পূর্ববর্তী যুগ কী ? হযরত মুহম্মদ (সঃ) কে দিয়ে এ ধর্মের শুরু হয়নি, তিনি এ ধর্মের শেষ নবী। অথচ না জেনে না বুঝে আমাদের দেশের কিছু লোক ইসলামের পূর্ববর্তী যুগের কথা বলেন এবং ইসলামের ইতিহাস বলতে তাঁরা হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর পরবর্তী যুগের ইতিহাস বুঝিয়ে থাকেন। ইহুদী, খৃস্টান ও মুশরিকদের অনুকরণে তাঁরা হযরত মুহম্মদ (সঃ) কে ইসলামের প্রবর্তক আর মুসলমানদেরকে ইংরেজীতে 'মোহামেডান' বলে থাকেন। ইসলাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণার অভাবেই মানুষ এরূপ বলে থাকে। আসলে ইসলামের শুরু হযরত মুহম্মদ (সঃ) কে দিয়ে তো হয়ইনি, এমনকি এর রোকন বা স্তম্ভসমূহও আগে থেকেই ছিল। কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি অনেক আগে থেকেই ইসলামের অঙ্গীভূত ছিল। এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ অবশ্যই আছে; তবে এখানে সংক্ষেপে কিছুটা আলোকপাত করা হ'ল [৭]ঃ

কলেমা ঃ হযরত আদম (আঃ) এর সময়ে কলেমা ছিল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আদামু ছাফিউল্লাহ্। হযরত নুহ্ (আঃ) এর পূর্ব পর্যন্ত এ কলেমাই চালু ছিল। অতঃপর হযরত নূহ্ (আঃ) এর সময় চালু হয় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু নূহুন্নাজিউল্লাহ্। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর পূর্ব পর্যন্ত এ কলেমা চালু থেকে তাঁর সময় থেকে চালু হয় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইব্রাহিমু খলিলুল্লাহ্। অতঃপর পর্যায়ক্রমে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইসমাঈলু জাবিহুল্লাহ্, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মূসা কালিমুল্লাহ্, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু দাউদু খলিফাতুল্লাহ্ এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ঈসা রুহুল্লাহ্। সর্বশেষ নবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর সময় থেকে মুসলমানদের কলেমা হয় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্। এই শেষোক্ত কলেমাটি পূর্বের উম্মত সমূহের মাঝেও চালু ছিল বলে মনে হয়। হযরত আদম (আঃ) এই কলেমা জপ করেই পাপমুক্ত হয়েছিলেন। আবার এই শেষ কলেমা চালু হওয়ার কারণে পূর্ববর্তী কোন কলেমাই কিন্তু বাতিল হয়নি। এখনও নিষ্ঠাবান মুসলমানগণ উল্লিখিত ৮টি কলেমাই দোয়া গঞ্জল আরশের মধ্যে পড়ে থাকেন। আখেরী নবীর উম্মতগণ কলেমা-ই শাহদাত, কলেমা-ই তাওহীদ ও কলেমা-ই তামজীদ নামে আরও তিনটি কলেমা পড়ে থাকেন, যার মাঝে পূর্বের নবী-রাসূলগণের

[৭] এই অংশের রেফারেন্স হিসেবে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) এর 'গুণিয়াতুত্বালেবীন' দ্রষ্টব্য। বইটি এখন বাংলায় পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

উপরও ঈমানের ঘোষণা আছে। এই শেষোক্ত ৩ টি কলেমা পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মাঝে চালু ছিল কিনা তা আমাদের জানা নেই। যে সাতটি বিষয়ের উপর ঈমান থাকা মুসলমান হওয়ার পূর্ব শর্ত তার মাঝে পূর্ববর্তী কিতাব ও নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমানও সংশ্লিষ্ট (দ্রঃ সূরা বাকারাহ্ ঃ ২৮৫-২৮৬)। অর্থাৎ – বর্তমান যুগের মুসলমানরা কোন বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় নয়, শেষ যুগের ইসলামও কোন বিচ্ছিন্ন ইসলাম নয়; বরং প্রথম নবী ও মানব থেকে শেষ নবী পর্যন্ত একই ধারাবাহিকতায় গ্রথিত অবিচ্ছিন্ন এক জাতি, অবিচ্ছিন্ন এক ধর্ম।

সালাত বা নামাজ ঃ ফজরের দুই রাকাত নামাজ সর্ব প্রথম হযরত আদম (আঃ) পড়েছিলেন আরাফাতের ময়দানে আল্লাহ্র ক্ষমালাভের পর। তৎপর এই দুই রাকাত নামাজ মুসলমানদের জন্য ফরজ হয়ে যায় এবং হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-কে আল্লাহ্ পাক নমরুদের আগুন থেকে নাজাত দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত ওই এক ওয়াক্ত নামাজই মুসলমানরা পড়ত। অতঃপর হযরত ইব্রাহিম (আঃ) নমরুদের আগুন থেকে মুক্ত হয়ে পড়লেন জোহরের নামাজ। সেদিন থেকে চালু হয় জোহরের নামাজ। হযরত ইয়াকুব (আঃ) তৎপুত্র ইউসুফ (আঃ) এর সংবাদ প্রাপ্তির পর পড়েন আছরের নামাজ এবং মুসলমানদের মাঝে এ নামাজ চালু হয়। তারপর হযরত ইউনুস (আঃ) মাছের পেট থেকে মুক্ত হওয়ার পর পড়েছিলেন মাগরিবের নামাজ। এই চার ওয়াক্ত নামাজই শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর উম্মতের পূর্ববর্তী উম্মতগণ পড়েছেন। সর্বশেষ নবী (সাঃ) এর মে'রাজের রাত্রে ওই ৪ ওয়াক্তের সাথে এশা যোগ করে সর্বমোট ৫ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয় 'ওই ৫ = ৫০' হিসাবে।

রোজা ঃ রোজাও পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর ফরজ ছিল, তবে তা রমজান মাসে নয়। প্রতি চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ তাঁরা রোজা রাখতেন। হযরত আদম (আঃ) সর্ব প্রথম এই তিনটি রোজা আল্লাহ্র আদেশে রাখেন, যাতে তাঁর শরীরের হারানো রং তিনি ফিরে পান এবং তার পরে তিনি এই তিনটি রোজা কখনও পরিত্যাগ করেননি। তখন থেকেই এই ৩ টি রোজা মুসলমানদের জন্য ফরজ হয়ে যায়। অর্থাৎ - তাঁদের উপর বছরে রোজা ছিল ৩৬ টি। অবশ্য কোন কোন বর্ণনায় হযরত ঈসা (আঃ) এর অনুসারীদের মাঝেও রমজানের ৩০ টি রোজা চালু থাকার কথা পাওয়া যায়। হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর সময় রমজান মাসের রোজা ফরজ হওয়ার পর উক্ত রোজা তিনটি আইয়ামে বীজের রোজা হিসেবে নফল বা সুন্নত রোজায় পরিণত হয়। আলীমদের মতে

www.pathagar.com

এ তিনটি রোজার অনেক ফজিলত। (হাদীসের সনদ পরম্পরায়) হযরত আঃ কাদের জিলানী (রঃ)এর বর্ণনা মতে ১৩ তারিখের রোজায় ১০ হাজার বছরের রোজার ছওয়াব, ১৪ তারিখের রোজায় ৩০ হাজার বছরের রোজার ছওয়াব এবং ১৫ তারিখের রোজায় ১ লক্ষ বছরের রোজার ছওয়াব পাওয়া যায়।

হজ্জ ঃ সর্বপ্রথম হজ্জ করেন হযরত আদম (আঃ)। হজরে আসওয়াদ তাঁর সময়কার স্মৃতি বুকে বহন করে। তাঁর সময়ে এ পাথরটি ছিল সাদা। মানুষের চুম্বনে পাপের ছোঁয়ায় এটির রঙ আজ কালো। হযরত নূহ্ (আঃ)ও হজ্জ করেছেন, কিস্তিতে আরোহণ করেই। বন্যার সময় আল্লাহ্ পাক কা'বাকে তুলে নেন এবং এর বাইরের অবকাঠামো ভূলুণ্ঠিত হয়। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর সময় তৎকর্তৃক সে অবকাঠামো আবার নবরূপ লাভ করে। কা'বার নির্মাণ কাজ শেষ হলে আল্লাহ্ হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-কে নির্দেশ দিলেন কা'বার তাওয়াফ ও হজ্জ করার জন্য মানবজাতির উদ্দেশ্যে আওয়াজ দিয়ে কা'বার দিকে আহ্বান করতে। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) নিবেদন করলেন যে, সেই নির্জন প্রান্তরে তো তাঁর আহ্বান শোনার কেউ নেই। কি করে মানুষের কানে তাঁর আহ্বান পৌঁছবে? আল্লাহ্ তাঁকে বললেন যে, হযরত ইব্রাহিম (আঃ) শুধু আহ্বান করবেন, মানুষের কানে তা পৌঁছানোর দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্র। অতঃপর আল্লাহ্র নির্দেশমত তিনি মানুষের উদ্দেশ্যে বুলন্দ আওয়াজে আহ্বান জানালেন কা'বার হজ্জ করতে। সে আওয়াজ বা আহ্বান যার যার কানে আল্লাহ্ পৌঁছে দিয়েছেন তার তার ভাগ্য হচ্ছে হজ্জ করার। আর সে সময় থেকে আজও মুসলমানরা হজ্জ সম্পাদন করে আসছেন। ইসলামের এ রোকনও নতুন নয়।

যাকাত ঃ যাকাতও পূর্ব থেকে চালু ছিল। হযরত মূসা (আঃ) এর সময় কারূণ ও তার সহযোগীরা যাকাত দিতে অস্বীকার করে এবং স্বয়ং নবী (আঃ) এর নামে মিথ্যা অপবাদ রটায়। শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ্ পাক কারূণকে তার ধন-সম্পদসহ মাটির নীচে ধ্বসিয়ে দেন। এ ঘটনা মুসলমান মাত্রেই জানেন। আজও কারূণের দীঘি নামে মিসরে একটি বড় গর্ত বা জলাশয় বিদ্যমান, যা কারূণের মাটির নীচে প্রোথিত হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। ওখানেই আল্লাহ্ পাক তাকে ধ্বসিয়ে দিয়েছিলেন।

উপরে বিধৃত প্রতিটা বিষয়ই সুস্পষ্ট করে ঘোষণা করছে যে, ইসলাম চিরকাল ছিল। এ দ্বীন নতুন কোন ব্যাপার নয় এবং মুসলমানরা পূর্ববর্তীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা কোন জাতিও নয়। তাঁরা পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদেরকে নিজেদের নবী-রাসূল বলেই জানেন ও মানেন, ক্ষেত্র বিশেষে তাঁদের সুন্নতেরও অনুসরণ করে থাকেন যেমন করেন তাঁরা

www.pathagar.com

সর্বশেষ নবী (সঃ) এর অনুসরণ। এর পরেও যারা ইসলামকে কনিষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করবে তাদের ব্যাপারে ফায়সালা একটাই, তারা অজ্ঞ।

ইসলামী শরীয়াহ্‌ই সবচেয়ে প্রাচীন

'নারী' গ্রন্থের লেখকের মতে ইহুদী ও খৃষ্ট ধর্মের ধর্মগ্রন্থ থেকে গৃহীত বিধি-বিধান ও নিয়মাবলী নিয়ে রচিত হয়েছে ইসলামী শরীয়াহ্ আইন। এরূপ বিভ্রান্তিকর বেহুদা তথ্য পরিবেশনের কারণে সহজেই বোঝা যায় যে, ইসলাম ধর্মের সাথে তিনি আদৌ পরিচিত নন। ইহুদী ও খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থ দুটি যে বিকৃত হওয়ার পূর্বে তাওরাত এবং ইঞ্জিল নামে ইসলামেরই দুটি গ্রন্থ ছিল, এবং মানুষ নিজের প্রবৃত্তির তাড়নায় যে ও-দুটো পরিবর্তন করে নিয়েছে, এ কথা তাঁর জানা ছিল না। এ যুগে অবশ্য অনেকেরই ধারণা যে, আল-কোরআন নাজিল হওয়ার মধ্য দিয়েই বুঝি বা ইসলামের শুরু হয়েছে। একারণেই তারা ইসলামকে সর্বকনিষ্ঠ ধর্ম হিসেবে নির্দেশ করে থাকে। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। আল-কোরআন নাজিল হওয়ার পূর্বে আরও ১০৩ খানা গ্রন্থ আল্লাহ্ পাক মানুষের উপর নাজিল করেছিলেন। নিম্নের ছকে সে সব গ্রন্থের খতিয়ান দেয়া হ'ল ঃ

যে নবী/রসূলের উপর নাজিল হয়েছে তাঁর নাম	সহিফা/কিতাবের সংখ্যা
হযরত আদম (আঃ)	১০ খানা
হযরত শীষ (আঃ)	৫০ খানা
হযরত ইদ্রিস (আঃ)	৩০ খানা
হযরত ইব্রাহিম (আঃ)	১০ খানা
হযরত মূসা (আঃ)	১ খানা (তাওরাত)
হযরত দাউদ (আঃ)	১ খানা (যাবুর)
হযরত ঈসা (আঃ)	১ খানা (ইঞ্জিল)
হযরত মুহম্মদ (সঃ)	১ খানা (কোরআন)
	মোট - ১০৪ খানা কিতাব

www.pathagar.com

এই ১০৪ খানা গ্রন্থই ইসলামের গ্রন্থ এবং অভিন্ন শরীয়াহ্‌র উৎস। ১,২৪,০০০ (বর্ণনান্তরে ২,২৪,০০০) নবী, রাসূল বা পয়গাম্বর তাঁদের নিজ নিজ কওম বা জাতিকে তৎ তৎ কালে প্রচলিত গ্রন্থানুসারে ধর্ম ও শরীয়াহ্‌ শিক্ষা দিয়ে গেছেন। কিন্তু দুষ্ট প্রকৃতির মানুষের কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় এবং শয়তানের প্ররোচনায় কোরআন পূর্ববর্তী ১০৩ খানা গ্রন্থই একটু একটু করে বিকৃত হয়ে পুরোপুরি নতুন আদল লাভ করে ইসলামের স্বাভাবিক গন্ডী থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তাওরাত এবং ইঞ্জিলও এই জঘন্য কলুষতা থেকে রেহাই পায়নি। সবচেয়ে মজার কথা হ'ল, যখন যে গ্রন্থ এভাবে বিকৃত হয়েছে, তখন সেই গ্রন্থ যে ভাষায় নাজিল হয়েছিল সেই ভাষাও পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌র কিতাব পরিবর্তনকারী কওম বা জাতির আকস্মিক ধ্বংসই সম্ভবতঃ এর প্রধান কারণ। সে সব জাতির কোন কোন ভাষার নাম ও মৃতরূপ আজও মানুষ জানে। যেমন– সুরইয়ানী, আরামাইক, ইব্রাণী ইত্যাদি। যে সব জাতি আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করে ইচ্ছামত পাপ করার উদ্দেশ্যে তাঁর কিতাব পর্যন্ত বিকৃত করে নিয়েছে, সে সব অবাধ্য জাতির আবাসভূমির ধ্বংসাবশেষ আজও মাটির নীচ থেকে আবিস্কৃত হচ্ছে এবং মানুষকে শিক্ষার উপকরণ যোগাচ্ছে। কিন্তু মানুষ সত্যিকার শিক্ষা নিচ্ছে কই? উল্টা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। যে দুটি গ্রন্থের ব্যাপারে ইসলামী শরীয়াহ্‌কে জড়িয়ে বিভ্রান্তিকর কথা-বার্তা বলা হচ্ছে, সে দুটি গ্রন্থেরও ভাষা এবং ভাষাভাষী আজ পৃথিবীতে নাই, বিলুপ্ত। কারণ মানুষ ওখানেও বিকৃতি ঘটিয়েছে, নিজেদের ইচ্ছামত রচনা করেছে *পুরাতন নিয়ম* আর *নূতন নিয়ম*। আল্লাহ্‌র বিধান যেহেতু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় এক ও অভিন্ন, সেহেতু ওই দুটি গ্রন্থের অবিকৃত অংশের সাথে সর্বশেষ গ্রন্থ আল-কোরআনের মিল থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক। তা ছাড়া আল-কোরআনেই তো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, এই মহাগ্রন্থ পূর্বের নাজিলকৃত গ্রন্থসমূহের সারবস্তু এবং এটা নাজিল হওয়ার কারণে পূর্বের ১০৩ খানা কিতাব বাতিল হয়ে গেল। এত সোজা কথা না বোঝার কি কারণ থাকতে পারে ? আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসূলগণ কি একই বিষয় বা একই ঘটনা দুইভাবে বর্ণনা করবেন বলে মানুষ প্রত্যাশা করে ? নাকি একই ব্যাপারে ১০৪ খানা গ্রন্থে ১০৪ রকমের বিধান আল্লাহ্‌ দেবেন বলে পাপীরা কামনা করে ? পাপীরা যে কামনাই করুক, আল্লাহ্‌র বিধান সুস্পষ্ট।

এক সময় আল-কোরআনের আদলেই পৃথিবীতে প্রচলিত ছিল তাওরাত, অতঃপর যাবুর, অতঃপর ইঞ্জিল। একটা বিকৃত হওয়ার পর নাজিল হয়েছে অন্যটা,

www.pathagar.com

ধারাবাহিকভাবে। আজকের পৃথিবীতে প্রচলিত মানব-রচিত বাইবেলের কত কাল আগের সে কথা ! বছর বা যুগের হিসাব দিয়ে এ সময় নির্ধারণ করা যাবে না। সে এক বিপুল সময়ের ব্যাপার যার ইতিহাস বর্তমান যুগের মানুষের কাছে, বিশেষ করে অমুসলিমদের কাছে নাই। মুসলমানরা এ ইতিহাস জানে, কিন্তু সে ইতিহাসের সন-তারিখ নাই, যেহেতু তখনও বর্ষ গণনা পৃথিবীতে শুরু হয়নি। ভাবলে চলবে না যে, এই সুবিপুল সময়ের ব্যবধানে ইসলাম বুঝি পৃথিবী থেকে একেবারে হারিয়ে গিয়েছিল। অবশ্যই তা হয়নি। কারণ, পবিত্র কা'বা গৃহ সব সময়ই পৃথিবীতে স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল ছিল।

কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত – ইসলামের এই পাঁচটি মূল স্তম্ভ পূর্বেও ছিল, এখনও আছে। বিয়োগ তেমন কিছুই হয়নি, কিছু কিছু যোগ হয়েছে মাত্র। যেমন, এশার নামাজ যোগ হয়েছে, পূর্বের প্রতিমাসের ১৩,১৪,১৫ তারিখের রোজা বাতিল হয়ে পূরা রমজান মাসের রোজা ফরজ হয়েছে, সেই সব যুগের রসূলদের নামযুক্ত কলেমার স্থলে সর্বশেষ রসূলের নামযুক্ত কলেমা হয়েছে ইত্যাদি। এ পরিবর্তন অতি সামান্যই। কাজেই পূর্ববর্তী শরীয়াহ্‌র অনুরূপ শরীয়াহ্‌ই এখানে পাওয়া যাবে, পাওয়া না গেলেই বরং সেটা বিস্ময়ের ব্যাপার হত। সে বিস্ময় ঘটেনি বলেই তো এটা ইসলাম শরয়িাহ্‌, ইহুদী আর খৃষ্টানের শরীয়াহ্‌ নয়। এক হলে তো মুসলমানদের সাথে ওদের কোন পার্থক্য থাকত না। অথচ ওদের আর মুসলামানদের মধ্যে কত পার্থক্য !

মুসলমানদের মত ওরা কলেমা পড়ে না, নামাজ পড়ে না, রোজা রাখে না, হজ্জ করে না, যাকাত দেয় না, হারাম-হালালের ধার ধারে না, পর্দার আয়াত মানে না, খাৎনা করে না (ইহুদীরা করে), জবেহের নিয়ম মানে না, সুদ ও ব্যভিচার বর্জন করে না, ফরজ গোসল করে না, কোরবাণী করে না। ওরা হযরত মুহম্মদ (সঃ) কে নবী বলে স্বীকার করে না। যাঁদেরকে ওরা নবী বলে স্বীকার করে তাঁদেরকেও ওরা বাস্তবে মানে না; ওদের নবীরা একনিষ্ঠ মুসলমান ছিলেন, কোন অংশেই কোন ঘাটতি ছিল না তাঁদের (মুসলমানরা তাঁদেরকেও নবী বলে স্বীকার করে এবং তাঁদের কিতাবকেও নিজেদের কিতাব বলে মান্য করে।)। ওরা এমনকি আল্লাহ্‌র একত্বে ও পবিত্রতায়ও বিশ্বাস করে না। 'আল্লাহ্‌' নামটি পর্যন্ত ওরা উচ্চারণ করে না, স্বীকারও করে না। ওরা ওই দুই জাতি সৃষ্টিকর্তার জন্য স্বতন্ত্র দুটা নাম সৃষ্টি করে নিয়েছে, মুসলমানরা যা চেনেও না, বোঝেও না। মুসলমানদের কাছে ওরা তাই বর্জনীয়, মুসলমানরা যেমন ওদের কাছে ঘৃণ্য। মুসলমানের ঘরে জন্মলাভকারী সকল বিদ্রোহী অমুসলিমের ওরা

www.pathagar.com

আশ্রয়দাতা। কি করে মুসলমানরা ওদের শরীয়াহ্ ধার করল ? ওদের শরীয়াহ্ই বা কি, সেটাও তো পরিষ্কার নয়। যেটা বোঝা গেল না সেটা নকল করা গেল কিভাবে ? দাবীর পশ্চাতে তো যুক্তি থাকতে হবে।

ইসলামী শরীয়াহ্ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে হুমায়ুন আজাদ ইহুদী-খৃস্টানের ধর্মবিধির সাথে যেমন ইসলামকে গুলিয়ে ফেলেছেন তেমনি ইসলামের অনেক বিষয় তিনি একেবারেই বুঝতে পারেননি। খুব বেশী উদাহরণ দেয়ার দরকার নাই। শুধু আদম-হাওয়ার ঘটনা উল্লেখ করাই যথেষ্ট। "... এ গল্পের অসীম প্রভাব রয়েছে ইহুদী-খৃস্টান-মুসলমানের উপর... এ কাহিনীতে আরও নানা বিষয় রয়েছে, যেমন মানুষ কী ভাবে হারায় তার আদিম সারল্য, জ্ঞান কীভাবে আসে, বা আসে মৃত্যু। বিধাতা আদমকে জানিয়েছিল যে নিষিদ্ধ ফল খেলে তারা মারা যাবে, কিন্তু দেখা যায় বিধাতা সত্য কথা বলে নি, বরং শয়তানই বলেছিল সত্য যে তারা মরবে না। নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার ফলে তারা মারা যায় নি, শুধু বুঝতে পেরেছে যে তারা নগ্ন; এবং সে জন্য লজ্জা বোধ করেছে।' লেখক 'নারী'র ৪০ পৃষ্ঠায় বাইবেলের বর্ণনার সাথে ইসলামের আল-কোরআন ও আল-হাদীসের বর্ণনা একাকার করে ফেলেছেন। কিন্তু সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান যা বস্তুতঃ দৃশ্যমান। যেমন ঃ

১. বাইবেলে নিষিদ্ধ ফলটিকে বলা হয়েছে জ্ঞানবৃক্ষের ফল। যুক্তিটা হল ফলটা খাওয়ার পর আদম-হাওয়া বুঝতে পেরেছে যে, তারা নগ্ন। অর্থাৎ- তারা আগে থেকেই নগ্ন ছিল এবং তারা এতই বোকা ছিল যে, ফলটি খাওয়ার আগে নিজেদের নগ্নতার ব্যাপারটা তারা বুঝতেই পারেনি। কিন্তু আল-কোরআনে আদম-হাওয়াকে এতটা বোকা রূপে দেখানো হয়নি, নিষিদ্ধ ফলটিরও কোন নাম দেয়া হয়নি, তবে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে গন্দম। এটি গম জাতীয় ফল, জ্ঞানের সাথে এর কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। ফলটি খাওয়ার পর তাঁরা নগ্ন হয়ে পড়েন, তাঁদের লজ্জাস্থান তাঁদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ- অন্যান্য প্রাণীর মত তাঁদের পরনেও প্রাকৃতিক বাড়তি আবরণ ছিল গন্দম খাওয়ার পর যা প্রাকৃতিক উপায়ে (সম্ভবতঃ পর্যায়ক্রমে, সময়ের ব্যবধানে) খসে পড়ে, নগ্নদেহ বেরিয়ে পড়ে। তাঁরা আঞ্জির ও ডুমুর বৃক্ষের পাতা জড়িয়ে নিজেদের লজ্জা নিবারণ করেন যার উল্লেখ বাইবেলে নেই।

www.pathagar.com

২. বাইবেলে উল্লেখ আছে ফলটি খেলে তারা মারা যাবে, আল-কোরআনে যার উল্লেখ নেই। তবে হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে, গন্দম খাওয়ার পর তাঁদের মল-মূত্র ত্যাগ ও নিম্নাংগ সংক্রান্ত অন্যান্য ক্রিয়া-প্রক্রিয়া শুরু হয় যা বেহেশতে সম্পূর্ণ নতুন। অর্থাৎ –মরণশীল মানুষের লক্ষণাদি প্রকাশ হয়ে পড়ে।

৩. নগ্ন হওয়ার কারণে বা মল-মূত্র ত্যাগ বা অন্যান্য উপসর্গের কারণে তাঁদেরকে দুনিয়ায় নিক্ষেপ করা হয় যা আসলে মরজগত। এদিক থেকে বাইবেলে বর্ণিত মৃত্যুর কথাটাও সত্য হয়ে যায়। শয়তানের নয়, বরং স্রষ্টার বাণীই সত্য হয়ে যায়। কিন্তু আজাদ সাহেব পথভ্রষ্ট কিছু ইউরোপীয় লেখকদের অনুকরণে শয়তানের বাণী সত্য বলে ধরে নিয়েছেন যেহেতু আদম হাওয়া ফলটি খাওয়ার সাথে সাথে চিৎপটাং হয়ে মরে যাননি। এখানে উল্লেখ্য যে, বাইবেল আসলে বিকৃত ঈঞ্জিল যার সব বাণী বিকৃত নয়। অবিকৃত অংশের সাথে কোরআন-হাদীসের মিল থাকাটাই তো স্বাভাবিক।

বই পড়ে পন্ডিত হওয়া যায়। কিন্তু সত্য পান্ডিত্যের অনেক উর্ধ্বের জিনিস। ইংরেজ কবি মিল্টনের *প্যারাডাইজ লস্ট* প্রকাশিত হওয়ার পর কিছু ইংরেজ সমালোচক শয়তানকে সত্যবাদী আর স্রষ্টাকে মিথ্যাবাদী বলতে শুরু করেন, যেহেতু কথিত ফল ভক্ষণের পর আদম-হাওয়া মারা যাননি। তাঁদের কারুরই মনে হয়নি যে, ফলটি খাওয়ার পর তাঁদেরকে যেখানে পাঠানো হয়েছে সেটা মরজগত। অর্থাৎ – ফলটি খাওয়ার কারণে আসলে তাঁদের মৃত্যুই হয়েছে। ডঃ আজাদ ওইসব সমালোচকদের ভাবসন্তান, সত্য কোথায় তা তাঁরও জানা ছিল না, যেমন তাঁর জানা ছিল না আল-কোরআন আর বাইবেলের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়। শয়তানকে যারা সত্যবাদী বলে মনে করেন, লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়াটাকে যারা জ্ঞানের বিকাশ বলে মনে করেন, পাপ আর অশ্লীলতার সাধনা ছাড়া তাদের কাছ থেকে আশা করার মত আর কী থাকতে পারে ?

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র বিধান পুরাতন হয় না

ডঃ আজাদ নতুনের পিয়াসী। তাঁর ভ্রমর-পিয়াসী মন যেমন নিত্য নতুন সঙ্গিনী খুঁজতো, তেমনি নারীর উৎকট হিতাকাংখায় এমন অনেক কিছুই তিনি করতে চাইতেন ইসলামী শরীয়াহ্‌ যা নারীর কল্যাণেই সমর্থন করে না। ইসলামের বিধি-বিধান নর-নারীর কল্যাণের জন্যই নাজিলকৃত। কিন্তু আজাদ সাহেবের সমস্যা হলো ইসলামী শরীয়াহ্‌ যে মানুষের হাতে গড়া কোন নোংরা-নশ্বর ব্যাপার নয় সেই জ্ঞানটুকু তাঁর ঘটে ছিল না। যে লোক আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেই ব্যর্থ, যার বুদ্ধি ও অনুভূতি নিজের স্রষ্টার উপস্থিতি অনুভব করার মতও সজাগ নয়, তাঁকে নিয়ে কথা বলতেও বাস্তবিক খারাপ লাগে। কিন্তু কথা বলতে হবে। কারণ তিনি চুপ থাকেননি, বরং অনেক অনেক কথা তিনি লিখেছেন যা পড়ে মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে। এ ব্যাপারে চুপ থাকলে বিভ্রান্তি বেড়েই যাবে। তিনি বলেছেন ইসলামী শরীয়াহ্‌ চৌদ্দশত বছর আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে বলে মুসলমান নারীর অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। ('নারী', তৃতীয় সংস্করণ, পঞ্চদশ মুদ্রণ, আগামী প্রকাশন, পৃঃ ১০)। কথাটি বোকামীদুষ্ট। নারী বর্তমান দুনিয়ায় যতটা অশান্তির মধ্যে আছে ততটা অশান্তি তার কখনও ছিল না। তার এই অশান্তির মূল কারণ শরীয়াহ্‌র অবলোপন। যেখানে শরীয়াহ্‌ আছে নারী আজও সেখানে ভাল আছে। নিরাপদ আছে। সম্মানিতা আছে। সৌদী আরবে আজও নারী রাত দুটার সময়ও নিরাপদে মসজিদে গিয়ে তাহাজ্জুদ আদায় করতে পারে ; ঈভটিজিং বলে আজও ওখানে কিছু নেই। এরকম আরও দু'একটি দেশ আছে যেখানে নর-নারীর সম্পর্ক আজও কলুষমুক্ত, স্বাভাবিক ও সম্মানজনক। শরীয়াহ্‌র উপস্থিতির কারণেই সেটা সম্ভব হয়ে থাকে। আজাদ সাহেবদের কামনা বাস্তবায়িত হলে ওসব দেশেও নারী বিপদগ্রস্ত হতো, যেমন ওনাদের চাহিদা মতো আমাদের নারীরা এখন ডাঙ্গার মাছের মতো অসহায়, আর বিনষ্ট পুরুষদের রিপুর তাড়না ষোলকলায় পরিপূর্ণ। ওনারা এখন চাচ্ছেন ইসলামী শরীয়াহ্‌র পরিবর্তন, অর্থাৎ বিলুপ্তি। ইসলামী শরীয়াহ্‌র বিধি-বিধান আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আগত, ওর সামান্য পরিবর্তনও বস্তুত বিলুপ্তি। আসলে ইসলামী শরীয়াহ্‌য় কোন পরিবর্তন প্রয়োজন নেই। কারণ ওগুলো আল্লাহ্‌র বাণী।

আল্লাহ্‌র বাণী চির নতুন। কখনও পুরানা হয়না। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি যেমন চির-ভাস্বর, তাঁর বাণীও তেমনি চির-অম্লান। কিন্তু মানুষের মধ্য হতে একটি দল আল্লাহ্‌র বাণী পাল্টাতে

www.pathagar.com

চায়। যুগের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য তাঁরা শরীয়াহ্‌র পরিবর্তন চায়। কিন্তু যুগেরই উচিৎ ছিল নিজের কল্যাণে শরীয়াহ্‌র সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়া। যেটুকু তার শরীয়াহ্‌র সাথে মেলে না সেটুকু তার বিভ্রান্তি, ক্ষেত্র বিশেষে অপরাধ। অপরাধ আর অপরাধীর সাথে আল্লাহ্‌র বিধান আপোষ করবে এ রকম চিন্তা অপরাধীর পক্ষ থেকে আর একটি নতুন অপরাধ। অবশ্য অপরাধীদের ধারণা তারা মুক্ত চিন্তা করছে। কিন্তু এটাকে মুক্ত চিন্তা বলা যায় না, বরং এটা নিতান্তই রিপুর তাড়না। ইসলামী শরীয়াহ্‌র সাথে মানুষের যে বস্তুর বিরোধ সেটা আসলে রিপু তথা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। যারা মুক্ত চিন্তা করছে বলে মানব সমাজে ধারণা চালু আছে, তাদের ব্যক্তি-জীবন অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে যে, তারা প্রত্যেকেই রিপুর বশ এবং তাদের 'মুক্তি'র শ্লোগানটা আসলে রিপুর তাড়না ছাড়া আর কিছু নয়। রিপুকে অত্যধিক প্রাধান্য দিলে বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়, তাড়না মরে গেলেও তাই বকবকানি বন্ধ হয় না। ইসলামী শরীয়াহ্‌য় রিপুর তাড়না-দুষ্ট যাবতীয় কাজ ও বিষয় হারাম বলেই তারা প্রথম যাকে আক্রমণ করে সে ইসলামী শরীয়াহ্‌। কিন্তু ইসলামী শরীয়াহ্‌ পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নাই, পরিবর্তনের সাধ্যও মানুষের নাই, যেমন তার সাধ্য নেই সৃষ্টি-প্রকৃতির পরিবর্তন করা। চৌদ্দশত বছর আগে যেমন ছিল শরীয়াহ্‌ এবং প্রকৃতি উভয়কেই তেমনি থাকতে দিতে হবে। মানুষের মনে রাখতে হবে ঃ

১. আম গাছে চৌদ্দশত বছর আগেও আম ফলত, এখনও আম ফলে, জাম বা কাঁঠাল ফলে না। আবার জাম বা কাঁঠাল গাছে একই ভাবে জাম বা কাঁঠালই ফলে, আম ফলে না। চৌদ্দশত বছর আগেও এক মোরগ দিয়ে বাড়ীর সব মুরগীর কাজ চলত, এখনও চলে। তখনও মোরগ-মুরগীর পারস্পরিক আচরণ যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। তখনও মুরগী ডিম দিত, এখনও ডিম দেয়, মোরগে ডিম দেয় না; বরং মোরগ দিয়ে ডিম দেওয়াতে গেলে হাঙ্গামা বাড়বে ছাড়া কমবে না। তখনও পাহাড়ী গাই-বাছুরগুলো নিজেদের নিরাপত্তার জন্য পাহাড়ী বলদের ব্যূহের ভিতরে রাত কাটাতো, এখনও কাটায়।[৮] তখনও মানুষ ভাত-রুটি খেত, এখনও খায়। তখনও প্রাণীর কাম-ক্ষুধা-তৃষ্ণা ছিল, এখনও আছে এবং ওসব মেটানোর পদ্ধতি ও উপকরণ কোনটাই পাল্টায়নি। পাল্টায়নি মানুষের জৈবিক ব্যবস্থার কোন কিছুই। তখনও মানুষের জন্ম-মৃত্যু যেমনটি ছিল, এখনও তেমনটিই আছে। কারণ তখনও 'জন্ম = মৃত্যু' ছিল, এখনও তাই আছে। পার্থক্য নেই, যত জন জন্মে ঠিক তত জনই মরে। মানুষের গড়া কৃত্রিম বস্তু

[৮] *Animal Behavior* : Grolier International Encyclopedia, Connecticut..

www.pathagar.com

আর তার ব্যবহার-ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন এসেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার জন্য আল্লাহ্‌র নিয়মে পরিবর্তন আসবে কেন ? কেনই বা মানুষের জন্য প্রদত্ত শরীয়াহ্ মানুষের বোকামীর জন্য, দুষ্ট মানুষের দুষ্টামীর জন্য, নষ্ট মানুষের নষ্টামীর জন্য পরিবর্তন করা হবে ? আল্লাহ্‌র উপায়-উপকরণ তো কৃত্রিম নয়। অপরাধীদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, আল্লাহ্‌র প্রকৃতির নিয়ম চৌদ্দ শত বছর পূর্বে যা ছিল এখনও তাই আছে; আর ইসলামী শরীয়াহ্ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি-প্রকৃতির মত। ওর কোন পরিবর্তন নাই। চৌদ্দ শত বছর পূর্বে পানিতে মাছ হতো, এখনও হয়, কাঁঠাল বা আপেল গাছে মাছ ফলে না। তখন মানুষের শরীরে কাঁটা ফুটলে বেদনা অনুভব করত, এখনও করে; তখন মানুষ পায়খানা-প্রস্রাব করত, এখনও করে; তখন সুন্দরী নারী অথবা নগ্ন-অসুন্দরী নারী দেখলে পুরুষ কান্ডজ্ঞান হারিয়ে তার পেছনে ছুটত, এখনও ছোটে; তখনও শরীয়াহ্‌র বাঁধন না থাকলে ঈভটিজিং হতো, এখনও হয়; তখন কোন অঙ্গ কেটে গেলে রক্ত বের হত, এখনও বের হয়; তখন রক্তের রঙ লাল ছিল , এখনও লাল; তখন যেমন নারী-পুরুষের রক্তের পরিমাণ ও হিমোগ্লোবিনের মাত্রার তারতম্য ছিল, এখনও তাই আছে[৯]; তখন যার যার হৃৎপিন্ড তার তার হাতের মুঠির সমান ছিল, এখনও তাই আছে;[১০] তখন নারী-পুরুষের গড় উচ্চতার যে পার্থক্য ছিল, এখনও তা-ই আছে; তখন যেমন গর্ভস্থ সন্তানের নারী-পুরুষ হওয়ার বিষয়টি পুরুষের Y ক্রোমসোমের সংখ্যার উপর নির্ভর করত এবং এ সংখ্যাটি যেমন আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভর করত, এখনও তাই করে; তখন যেমন **fetus**-এ পুরুষ হরমোন টেস্টস্টেরণের অভাব হলে গর্ভস্থ সন্তানটি নারী হত এবং ওই হরমোনটির উপস্থিতির কারণে সন্তানটি পুরুষ হত, এখনও তাই হয়; তখন যেমন নর-নারীর মগজের কোষ-সংখ্যা, আকার এবং ওজনে পার্থক্য ছিল, এখনও তেমনি আছে; তখন যেমন নর-নারীর খাদ্য-ক্যালরী গ্রহণের মাত্রায় তারতম্য ছিল, এখনও তেমনি আছে।[১১] এ গুলো বৈজ্ঞানিক সত্য, প্রাকৃতিক সত্য, ডঃ আজাদ এগুলো জানলেও সত্য, না জানলেও সত্য ; তাঁর মতামতের কোন মূল্য এখানে নাই, তাঁকে জিজ্ঞেস করে আল্লাহ্‌র দুনিয়া চলে না। আল্লাহ্‌র প্রকৃতির নিয়মও কখনো পাল্টায় না। প্রকৃতির নিয়মের উল্টাদিকে কেউ অবস্থান নিলে তার ধ্বংস অনিবার্য। এটাও বৈজ্ঞানিক সত্য। নারীই হোক আর পুরুষই হোক, আল্লাহ্‌র নিয়ম সবাইকেই মেনে চলতে হবে। অমান্য করলে বিপদ অনিবার্য, উদাহরণ তো প্রতিদিনই ঘটে। অতীতেও বহু জাতি শরীয়াহ্ পরিবর্তন করে ধর্মচ্যুত হয়েছে, নতুন নামে নতুন ধর্মের

---

[৯] New Standard Encyclopedia: *Blood.*
[১০] Encyclopaedia Britanica :*Heart.*
[১১] New Standard Encyclopedia: *Baby, Chromosome, Hormone, male, female, Brain...etc.*

www.pathagar.com

দোকান খুলে বসেছে, ধ্বংস হয়েছে এবং জাহান্নামে স্থায়ী ঠিকানার বন্দোবস্ত করেছে। মানুষকে বুঝতে হবে যে, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন যতই আসুক, মানুষের জীবন-ব্যবস্থার মৌলিক বিষয়গুলির আসলে কিছুই পাল্টায়নি। আগে যেমন মানুষ ভাত-রুটি-মাছ-মাংস-ফল-মূল খেত, এখনও তাই খায়; আগে যেমন কেউ ক্লান্ত হলে ঘুমিয়ে পড়ত, এখনও সে রকমই ঘুমিয়ে পড়ে; আগে যেমন প্রেমের টানে ও জৈবিক তাড়নায় বিপরীত লিঙ্গের মানুষের কাছে মানুষ ছুটত এখনও তাই ছোটে; আগে যেমন প্রসব বেদনা ছিল এখনও সেরকমই আছে; আগে যেমন সুখ-দুঃখ বোধ আর হাসি-কান্না ছিল, এখনও তাই আছে; আগে যেমন মানুষ মারা যেত, এখনও মারা যায় ; আগে যেমন কামুক পুরুষ নারীকে ফুঁসলাতো, এখনো ফুঁসলায়। শুধু প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কারণে মানুষের জীবনের মৌলিক বিষয়ে পরিবর্তন আসতে পারে না, এ সহজ সত্য বোঝার মত বুদ্ধি না থাকলে মানুষের অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়বে। শরীয়াহ্ আইন বস্তুতঃ মানুষের প্রকৃতিগত বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করে এবং মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি নিয়েই তার কারবার বিধায় প্রকৃতির নিয়মের মতই শরীয়াহ্র নিয়মও অপরিবর্তনীয়, যেহেতু সে প্রকৃতির মতই স্রষ্টার কাছ থেকে অবতীর্ণ। আল্লাহ্র দেয়া কোন কিছুই তো পাল্টায় না, শরীয়াহ্ই বা পাল্টাবে কেন ? মানুষের দুনিয়ায় আগমনের দিন থেকে অদ্যাবধি আল্লাহ্র বিধানের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। না, শুধু মানুষের দুনিয়ায় আগমনের সময় থেকেই নয়, বরং তারও বহু বহু বহু আগে থেকে আল্লাহ্র সৃষ্টি-প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় বিধান দুনিয়ায় চালু ছিল। ইসলামী শরীয়াহ্ও হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর জন্মের বহু আগে থেকেই চলে আসছে। ওই মহান নবীর আবির্ভাবই তো হয়েছে মানুষের হাতে বিকৃত হওয়া ও বিলুপ্ত হওয়া সেই শরীয়াহ্ পুনরুদ্ধার ও পুনর্বহালের উদ্দেশ্যে। এই অপরিবর্তনীয় শরীয়াহ্র আবার পরিবর্তন কী ? কোন পরিবর্তন নাই। আল-কোরআন এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছে ঃ

''...তুমি আল্লাহ্র বিধানে কখনও কোন পরিবর্তন পাবে না এবং তাঁর বিধানে কোনরূপ বিচ্যুতিও দেখবে না।" (আল-কোরআন, সুরা ফাতির ঃ আয়াত ৪৩)

''আমার রসূলগণের মধ্যে যাঁদেরকে তোমার পূর্বে পাঠিয়েছিলাম তাঁদের ক্ষেত্রেও এরূপ নিয়মই ছিল এবং তুমি আমার নিয়মের কোন পরিবর্তন পাবে না।"

(আল-কোরআন, সুরা বণি ইসরাইল ঃ আয়াত ৭৭)

'' তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহ্র প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।"

(আল-কোরআন, সুরা রূম ঃ আয়াত ৩০)

www.pathagar.com

২. যে সব দেশে আল্লাহ্‌র শরীয়াহ্‌ যত বেশী অপরিবর্তিত ও কার্যকর সে সব দেশে তত বেশী শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজমান; অপরাধের মাত্রা, সংখ্যা ও পরিমাণ সেখানে খুবই কম; নারী-শিশু-বৃদ্ধ সেখানে আজও নিরাপদ। পক্ষান্তরে, যে সব দেশ শরীয়াহ্‌ আইনের যত বিরোধী সে সব দেশে শান্তি-শৃঙ্খলার তত বেশী অভাব; অপরাধের মাত্রা-সংখ্যা-পরিমাণ সেসব দেশে খুবই বেশী; নারী-শিশু-বৃদ্ধ সেখানে আরও বেশী বিপন্ন। এই তুলনার বাস্তব রূপ এতই প্রকট যে, কোন উদাহরণ টানার প্রয়োজন নাই। কারণ, প্রথমোক্ত দেশসমূহে এই দুর্দিনেও মানুষ সোনার দোকান খোলা রেখে মসজিদে চলে যেতে পারে, রাত দুটোর সময়ও যুবতী নারীরা তাহাজ্জুদ আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন বা অন্যান্য কাজে রাস্তায় চলাচল করতে পারে, কোন পক্ষেই কোন বিপদ বা হাঙ্গামা ঘটে না। আবার দ্বিতীয়োক্ত দেশ সমূহে দোকান তালাবন্ধ রেখেও চুরি ঠেকানো যায় না, লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে নারীর বস্ত্র হরণেও বাঁধে না[১২], আইনের পর আইন পাশ করেও শান্তি রক্ষা করা যায় না, খুনাখুনি যেন নিতান্তই সাধারণ ব্যাপার। শরীয়াহ্‌-শাসিত দেশ এবং শরীয়াহীন দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পাশিপাশি নিয়ে তুলনা করা হলে যে-কোন লোকের চোখই বলে দেবে যে, শান্তির স্বার্থে শরীয়াহ্‌ই উত্তম। কাজেই শরীয়াহ্‌ পাল্টানোর কথা বলাও এক বড় ধরনের অপরাধ। যারা শরীয়াহ্‌ পাল্টে নিত্য নতুন জুলুমের সূচনা করে তারা আর যা-ই হোক বুদ্ধিমানও নয়, শান্তিপ্রিয় মানুষও নয়।

৩. মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির চেয়ে মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র জ্ঞান-বুদ্ধি বেশী এবং উত্তম। মানুষ আল্লাহ্‌র শরীয়াহ্‌ বাদ দিয়ে যা নিজে সৃষ্টি করবে তা অবশ্যই শরীয়াহ্‌র চেয়ে নিম্ন গুণসম্পন্ন হবে, হয়েছেও তাই। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, শরীয়াহ্‌ যে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে তার প্রমাণ কি ? প্রমাণ স্বয়ং আল-কোরআন। আল-কোরআনের সত্যতা আল-কোরআন নিজেই প্রতিপাদন করে। আল্লাহ্‌ এ গ্রন্থকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করেই প্রেরণ করেছেন। তার সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য কোন ব্যক্তি, বস্তু বা কোন শাস্ত্রের উপর সে নির্ভরশীল নয়। সে যে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে তার প্রমাণ হাজার হাজার। এখানে তার কিছু কিছু উল্লেখ করা হ'লঃ

---

[১২] ২০০৬ সালে ইউরোপের এক স্টেডিয়ামে লক্ষ লক্ষ দর্শকের সামনে ১১ জন তরুণীকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে সটকে পড়েছিল একদল যুবক। দ্রঃ 'তরুণীদের বিবস্ত্র করে চম্পট' ঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ই জুন, ২০০৬, পৃঃ ১, কঃ ৪।

www.pathagar.com

(১) আল-কোরআন নাজিল হয়েছে নিরক্ষর নবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর উপর। কোন নিরক্ষর লোকের পক্ষে এরূপ একখানি গ্রন্থ রচনা করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। অতএব কোরআন আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই এসেছে। আল-কোরআনই শরীয়াহ্‌র মূল উৎস বিধায় শরীয়াহ্ আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই আগত বলে স্বপ্রমাণিত। এই শরীয়াহ্ যারা পাল্টাতে চায় বা অমান্য করে তারা বোকার পর্যায়েও পড়ে না।

(২) আল-কোরআনের আয়াতের মত কোন আয়াত দুনিয়ার সমস্ত মানুষ মিলেও রচনা করা সম্ভব নয়। আল-কোরআনে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক এই রূপ চ্যালেঞ্জ বার বার করেছেন, কিন্তু অবিশ্বাসীরা সে চ্যালেঞ্জ কখনও মোকাবেলা করতে পারেনি।

(৩) আল-কোরআনের কোন বাণী আজ পর্যন্ত মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি। এটি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে না এলে অবশ্যই কালের ব্যবধানে কোন না কোন আয়াত মিথ্যা বলে প্রমাণ হয়ে যেত।

(৪) আল-কোরআন পাঠ করে বা শুনে কখনও কেউ পৌনঃপুনিকতাজনিত তিক্ততা অনুভব করে না যা মানব রচিত যে-কোন গ্রন্থের বেলায় অনুভূত হয়। এ সত্য প্রমাণ করে যে, এটি মানব-রচিত নয় ; বরং আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আগত।

(৫) এতবড় একটি গ্রন্থের কোন আয়াতের সাথে কোন আয়াতের কোন বৈপরীত্য নাই। এতটা সুসমঞ্জস গ্রন্থ মানুষ কর্তৃক রচিত হতে পারে না।

(৬) আল-কোরআনে ৬ ধরনের আয়াত আছে। যথাঃ (ক) আয়াতে মুকাত্তিয়াত, (খ) আয়াতে হালালাইন, (গ) আয়াতে হারামাইন , (ঘ) আয়াতে মুহকাম, (ঙ) আয়াতে মুতাশাবিহ্ এবং (চ) আয়াতে আমছাল। এই ছয় ধরনের আয়াতের কোন আয়াতই আজ পর্যন্ত গুরুত্বহীন বা অসার বলে প্রমাণিত হয়নি এবং যে-কোন আয়াতই আল-কোরআনের অলৌকিকত্বের প্রমাণ বহন করে। তবে সাধারণতঃ আয়াতে মুকাত্তিয়াতের রহস্য উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে সাধারণের বোধগম্য প্রমাণসমূহ পেশ করা হয়ে থাকে। কোন কোন সূরার শুরুতে আলিফ-লাম-মিম, আলিফ-লাম-রা, ত্বা-হা ইত্যাদি রহস্যময় অক্ষরের সমন্বয় ঘটেছে। এগুলোকে আয়াতে মুকাত্তিয়াত বা মুকাত্তায়াত বলা হয়। কেউ কেউ এগুলোকে হরফে মুকাত্তিয়াতও বলে থাকেন। তবে পৃথক পৃথকভাবে এগুলো হরফ হলেও একত্রে বিবেচনা করলে অবশ্যই আয়াত। এগুলোর অর্থ মানুষের কাছে পরিষ্কার নয়। একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ এসবের অর্থ জানে না। তবে এই রহস্যময় অক্ষরগুলো যেসব সূরার শুরুতে রয়েছে সেসব সূরায় ওই অক্ষরগুলো যতবার ব্যবহৃত হয়েছে তার সামষ্টিক সংখ্যাকে ১৯ দ্বারা ভাগ করা হলে কোন ভাগশেষ বা

www.pathagar.com

অবশিষ্ট থাকে না। এত সুসমঞ্জস গ্রন্থ কী করে কোন মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব ? আল্লাহ্ ছাড়া আর কে এতবড় অলৌকিক গ্রন্থ নাজিল করার মত ক্ষমতার অধিকারী ? অবশ্যই কেউ নয়।

(৭) কোরআন আল্লাহর তরফ থেকে নাযিলকৃত একখানি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ; বস্তুতঃ আল-কোরআন নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ জ্ঞান যা আল্লাহ্ মানুষকে দয়া পরবশ হয়ে দান করেছেন। আল-কোরআনের অকাট্যতার প্রমাণ আল-কোরআন নিজেই বহন করে। এতে সন্নিবিষ্ট প্রত্যেকটি[১৩] সূরার উপরে রয়েছে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আল্লাহ্র তিনটি নাম সমৃদ্ধ এ মহীয়ান আয়াত দোযখের আগুন থেকে রক্ষার জন্য ঢাল স্বরূপ, আরবীতে এ আয়াতের অক্ষর সংখ্যা ১৯। এই ১৯ দ্বারা আল-কোরআনের সূরার সংখ্যা (১১৪) ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। অর্থাৎ আল-কোরআনে ব্যবহৃত মোকাত্তিয়াত অক্ষর সংখ্যা এবং সূরার সংখ্যা বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম-এ ব্যবহৃত অক্ষর সংখ্যা ১৯-এর গুণিতক । রুকুর সংখ্যাও ১৯ এর গুণিতক। আল-কোরআনে যতবার বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম ব্যবহৃত হয়েছে (১১৪ বার) তাও ১৯ এর গুণিতক। আর বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম-এর অক্ষর সংখ্যা দোযখসমূহের প্রহরীর সংখ্যার সমান। উল্লেখ্য যে, দোযখের প্রহরী ফেরেশতাদের সংখ্যাও ১৯, আয়াতে মুকাত্তিয়াতও ১৯ সংখ্যার সাথে সম্পৃক্ত এবং তা সংশ্লিষ্ট সূরা গুলির উপরের দিকেই সন্নিবিষ্ট; আবার বিসমিল্লাহ্ শরীফের সাংখ্য মানও ১৯। এই গুরুত্বপূর্ণ আয়াতটিতে আল্লাহ্র তিনটি নাম রয়েছে (আল্লাহ্, রাহ্মান ও রাহীম)। আল-কোরআনে উক্ত নাম তিনটি যতবার ব্যবহৃত হয়েছে তার সংখ্যাও ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। এই রহস্যময় বিষয়টির ঈঙ্গিত রয়েছে আল-কোরআনে ঃ

''আমি শীঘ্রই তাঁকে নিক্ষেপ করব সাকারে। তুমি কি জান 'সাকার' কি ? ওটা কাউকে জীবিতাবস্থায়ও রাখবে না, আবার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মুক্তিও দেবে না। এটা মানুষকে পুড়িয়ে বিকৃত করে ফেলবে। এই সাকারের তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশ জন ফেরেশতা। আর আমি দোযখের প্রহরী কেবল ফেরেশতাদেরকেই নিযুক্ত করেছি। আমি তাদের সংখ্যা এরূপ রেখেছি কাফেরদের পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে, যাতে কিতাব প্রাপ্তদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবীরা ও মু'মিনরা সন্দেহ পোষণ না

---

[১৩] ব্যতিক্রম সূরা তওবাহ্ । এ সূরায় বিসমিল্লাহ্ নাই, তবে অন্য একটি সূরায় মাঝখানেও একবার আছে যাতে মোট ১১৪ বার হয়। আলীমদের মতে তওবায় বিসমিল্লাহ্ না থাকার কারণ আল্লাহ্র দয়া নয়, বরং কঠোরতা প্রকাশ অনেক।

www.pathagar.com

করে এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা আর কাফেররা বলে, 'আল্লাহ্ এ অভিনব উক্তি দিয়ে কি বুঝাতে চেয়েছেন ?' এমনিভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সুপথে পরিচালিত করেন। আপনার রবের সৈন্য সংখ্যা তিনি নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না, তবে দোযখের এই বর্ণনা তো মানুষের জন্য কেবল উপদেশ মাত্র।" (আল-কোরআন, সূরা- মুদ্দাচ্ছির ঃ আয়াত ২৬-৩১)

(৮) আল-কোরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ। এত সুন্দর ও নিখুঁত গ্রন্থ কোন যুগেই কোন মানুষ কর্তৃক রচিত হওয়া সম্ভব নয়। মনুষ্য রচিত সকল গ্রন্থেই ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় সূরার শুরুতে 'এই সেই কিতাব যাতে কোন ভুল নাই' বলে সেই যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে বা বান্দাকে আল্লাহ্র পক্ষ হতে আশ্বস্ত করা হয়েছে আজও ওই বাণী অপ্রমাণিত হয়নি। কাজেই আল-কোরআন যে স্বয়ং আল্লাহ্ কর্তৃক নাজিলকৃত এর মাঝে কোন সংশয় থাকার অবকাশ নাই। আল-কোরআন পাঠ করার সময় যাদের ও কোরআনের মাঝে অদৃশ্য পর্দা পতিত হয় (সূরা বণী ইসরাঈল ঃ ৪৫-৪৬) তারা ব্যতীত আর কেউ কোরআন অবিশ্বাস করে না, অবিশ্বাস করার মত কোন কারণও নাই।

যার ঈমান নাই তার কাছে এ সব প্রমাণ স্পষ্ট হবে না, কারণ ঈমানহীন ব্যক্তির কাছে কোরআনের রহস্য চির-অজ্ঞাত থাকাই কোরআনের বিধান। তারা দুনিয়ার অনেক কিছুই বোঝে, কিন্তু কোরআন বোঝে না, তারা অন্ধ, বধির। ঈমানহীন ব্যক্তির নিকট কোরআনের এই বাস্তবিক দুর্জ্ঞেয় অবস্থান কোরআনের প্রতি ঈমানদারদের ঈমান আরও মজবুত করে। কারণ ওদের বেলায় যে এরূপ বিস্ময়কর অন্ধত্ব ঘটবে তা কোরআনেই বলা হয়েছে। হাজার করে বুঝালেও যখন ওরা বোঝে না এবং অকারণ খুঁত বের করার জন্য যখন ওরা খোঁড়া সব কুযুক্তির অবতারণা করে তখনই ঈমানদারগণ এই আয়াতের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যান। তারা অবাক বিস্ময়ে দেখেন যে, আল-কোরআনে যাদেরকে "মূক, বধির ও অন্ধ" বলে ঘোষণা করা হয়েছে তারা আসলেই মূক, বধির ও অন্ধ। অর্থাৎ– আল-কোরআনের প্রতি বিভ্রান্ত মানুষের অহেতুক অবিশ্বাসও আল-কোরআনের সত্যতা ও নির্ভুলত্বের একটি বড় প্রমাণ। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে এসেছে বলেই কোরআন এতটা সত্য ও নির্ভুল। আর সে কারণেই আল-কোরআনে নির্দেশিত শরীয়াহ্ও নির্ভুল। মূক, বধির এবং অন্ধ ছাড়া আর কেউ এ শরীয়াহ্ পরিবর্তন করতে চায় না, চাইতে পারে না। সূর্য যেমন সকালে পূর্ব দিকে উদিত হয়ে সন্ধ্যায় পশ্চিম দিকে অস্ত যায়, চাঁদ যেমন বাড়ে-কমে, মানুষের

www.pathagar.com

শরীরে যেমন রক্ত থাকে, শরীয়াহ্ আইন ঠিক সে রকমই চিরন্তন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ আইনের যেটুকু মানুষ পাল্টেছে বা পাল্টানোর চেষ্টা করেছে সেটুকুতেই বিপদ এসেছে। আল্লাহ্ জানেন মানুষের কি প্রয়োজন, আইনটা তিনি সেভাবেই দিয়েছেন। এ আইনে মুসলমানদের কোন অসুবিধা হয় না, বরং তারা শান্তিতে থাকে। অনেক অহেতুক অনাচারের হাত থেকে তারা মুক্ত থাকে। মানুষের বুদ্ধি কখনও আল্লাহ্র বুদ্ধির চেয়ে বেশী হতে পারে না। আল্লাহ্-প্রদত্ত শরীয়াহ্রও কোন বিকল্প থাকতে পারে না। শরীয়াহ্ সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সে নিজেও এক অপরাজেয় সত্য। সত্যের পরিবর্তন হয় না। এই শরীয়াহ্ যারা পরিবর্তন করতে চায় তারা নর-নারী উভয়ের শত্রু, মানবজাতির শত্রু, তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী প্রয়োজন।

দাসী নিয়ে কথা

হুমায়ুন আজাদের 'নারী' গ্রন্থটি আসলে কোন গ্রন্থ নয়, ধর্ম-বিদ্বেষী প্রচারণা মাত্র। নবী করিম (সঃ) কবে কোন দাসীর কাছে গিয়েছিলেন সেটা কারও বইয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় কেন হবে সেটা যেমন বোধগম্য নয়, তেমনি এই বিষয়টা নিয়ে আজাদ সাহেবের মত একজন উন্মুক্ত যৌনতার মানুষ কেন ছিছিৎকার করবেন তার ব্যাখ্যাও বইটিতে নাই। যে-কোন নারীর কাছেই যিনি যেতে পারেন এবং যাওয়াটা যিনি মানবিক অধিকার বলে মনে করেন তার জন্য কারও দাসী-গমনের বিষয়টি নিন্দনীয় হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ থাকতে পারে না। এরূপ নিন্দা অবশ্যই নিন্দনীয়, মাৎসর্য দোষে দুষ্ট, যা আসলে একটা রিপু। এ যুগের অনেক নারীবাদী পুরুষ যে রিপুর তাড়নায় তাড়িত হয়েই দিনরাত নারী নারী রবে বকর বকর করে ফিরছেন এটা তার একটা বড় প্রমাণ।

দাস-দাসীর ব্যবস্থাটি ইসলাম চালু করেনি। সংরক্ষণও করেনি। দাস-দাসী মুক্ত করে দিতে ইসলাম উৎসাহিত করেছে, দাস-দাসীর মুক্তির বিনিময়ে অফুরান পুণ্যের ঘোষণা দিয়েছে এবং কোন কোন পাপ ও ত্রুটি-বিচ্যুতির খেসারত বা কাফ্ফারা হিসেবে দাস-দাসী মুক্তির ব্যবস্থাপত্র নির্দেশ করেছে। দাস-দাসীর সাথে নিজেদের মত আচরণের বিধান চালু করেছে, যার ব্যত্যয় ঘটলে দাস-দাসী মুক্ত করে দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে। হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রাঃ) একবার এক দাসীকে রাগের মাথায় থাপ্পড়

www.pathagar.com

মেরেছিলেন, হযরত রাসূলে করিম (সঃ) সঙ্গে সঙ্গে সেই দাসীকে মুক্ত করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই থেকে দাস-দাসীকে কেউ প্রহার করলে তাকে আযাদ করে দেয়ার বিধান চালু হয়েছে। মালিক তার নিজের সমমানের অন্ন-বস্ত্র দাস-দাসীকে দিবেন ইসলাম এই বিধান চালু করেছে (দ্রঃ বিদায় হজ্জের ভাষণ)। এসব বিধি-বিধান মানতে গিয়ে ইসলামী বিশ্ব এক সময় দাস-দাসী শূন্য হয়ে পড়েছে। এসব বিষয় কিন্তু ডঃ আজাদ উল্লেখ করেননি, দাসের কোন বিষয়ও তাঁর আলোচনায় আসেনি। তিনি দাসীর সাথে ইসলামের শেষ নবী (সঃ) এর সম্পর্কের বিষয় নিয়ে নিন্দার ঝড় তুলেছেন। এ বিষয়টাকে তিনি ব্যভিচারের পর্যায়ে ফেলার চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন যা তাঁর অজ্ঞতাই আমাদের সামনে প্রকাশ করে দিচ্ছে। মালিকের সাথে দাসীর সম্পর্ক অবৈধ নয়, বৈধ। শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, সব সমাজেই বৈধ ছিল। কাজেই ওটাকে ব্যভিচার হিসেবে গণ্য করার কোন সুযোগ নেই।

নবী করিম (সঃ) কে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে দাসী প্রসঙ্গে ডঃ আজাদ যে ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন তা আদৌ ঘটেছে কিনা সে ব্যাপারেও সন্দেহের অবকাশ আছে। নির্ভরযোগ্য কোন উৎস থেকে তিনি ঘটনার উদ্ধৃতি দেননি। মুসলিম সমাজে প্রচলিত কোন কিতাব থেকে তিনি ইসলামের কোন জ্ঞানই আহরণ করেননি। ইসলামের শত্রু পক্ষের কারও লিখিত কোন গ্রন্থ ইসলামের কোন নবীর বিরুদ্ধে দলিল হিসেবে ব্যবহার অবশ্যই ন্যায়ানুগ নয়। আজাদ সাহেব এই অন্যায়টিই করেছেন টি পি হিউয়েজের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে নবী করিম (সঃ) এর চরিত্র নিয়ে কটাক্ষ করার ক্ষেত্রে। শুধু ইসলামে নয়, সারা দুনিয়ার সব জাতির মাঝেই দাসী[১৪] ব্যবহার বৈধ, কাজেই এ ঘটনা বাস্তবিক ঘটে থাকলেও কোন মুসলমান তাতে লজ্জাবোধ করবে না। কারণ এর মাঝে লুকোচুরির কিছু নেই। তথাপি যে কাহিনী 'নারী' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে তার মাঝে সত্যের লেশ মাত্রও নেই বলে মনে করার অনেক কারণ আছে। যেমন ঃ (১) কেউ তার নিজস্ব কোন নারীর সাথে মিলিত হওয়ার সময় কাউকে সাক্ষী রাখে না। ঘটনার সাক্ষী কেউ ছিল না, ডঃ আজাদ বা টি পি হিউয়েজ ঘটনা জানলেন কিভাবে ? (২) নবী করিম (সঃ) এর কোন স্ত্রী যদি ঘটনার পর পর সেখানে হাজির হয়ে তাঁকে কিছু বলেও থাকেন সেটা অন্য কারও জানার কথা নয়। আর যা-ই হোক, উম্মুল মোমেনিনগণ স্বামীর

[১৪] দাসী কিন্তু কাজের বুয়া নয়। কাজের বুয়া শ্রমিক মাত্র। সে স্বাধীনা নারী ; যুদ্ধবন্দিনীও নয়, ক্রীতাও নয়। সে কিন্তু হারাম। অতএব সাবধান। দাসীও কিন্তু শুধু তার মালিকের জন্যই বৈধ, অন্য কারও জন্য বৈধ নয়।

www.pathagar.com

গোপন কথা কাউকে বলবেন এটা মনে করার কোন কারণ নাই। (৩) নবী করিম (সঃ) এর কোন কাজে তাঁর কোন স্ত্রী অসন্তোষ প্রকাশ করতেন না। হযরত হাফসা (রাঃ) অত্যন্ত স্বামী পরায়ণা ছিলেন, তাঁর মতো একজন পূণ্যবতী নারীর নামে জনাব আজাদ যা বলেছেন তা নিতান্তই অপবাদ। অবিশ্বাসীরা এ রকম অপবাদ মুসলমানদের বিরুদ্ধে সব সময়ই রটিয়ে এসেছে। এ গুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করা মুসলমানদের জন্য পাপ। তবে যার যার অবস্থানে থেকে এসব অপবাদ যথাসম্ভব খন্ডনের চেষ্টা করা কর্তব্য।

ইসলামের বিধি-বিধান পাপীদের কাছে পরিষ্কার নয়। পাপীদের মূল্যবোধ স্বতন্ত্র, তাদের বিচারজ্ঞান স্বতন্ত্র, তারা পূণ্যবানদেরকে সবসময় ক্রিমিনাল বলে মনে করে। কিন্তু তাতে মুসলমানদের কিছু যায় আসে না। মুসলমানরা আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবে। আল্লাহ্ কেন দাসী আর তার মালিকের মধ্যকার দৈহিক সম্পর্ক বৈধ করেছেন (দ্রঃ আল-কোরআন, সূরা মুঁমিনূন ঃ আয়াত ১-৭ ; সূরা নিসা ঃ আয়াত ২৪) এবং কেন বয়-ফ্রেন্ড আর গার্ল-ফ্রেন্ডের 'ডেটিং' বা 'লিভিং টুগেদার' হারাম করেছেন তা জানেন আল্লাহ্। আল্লাহ্‌র বিধানের ব্যাপারে কারও প্রশ্ন তোলার অধিকার নেই। তিনি কারও কাছে জবাবদিহি করেন না, সবাইকেই তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। অবিশ্বাসীরা যদি আল্লাহ্‌র কোন ফয়সালার জবাব চায় তো সে জবাব দিতে মুসলমানরা বাধ্য নয়। আল্লাহ্‌র বিধান যে মানবে সে মুসলমান, যে মানবে না সে মুসলমান নয়। একদম সোজা কথা। নাস্তিক যদি মনে করে যে, তার নাস্তিক হওয়ার অধিকার আছে, তবে তাকে এও স্বীকার করতে হবে যে, মানুষের আস্তিক ও মুসলমান হওয়ারও অধিকার আছে। কেউ যদি আল্লাহ্‌র কোন বিধি-ব্যবস্থা না বোঝে তো না বুঝবে, সে জন্য ওই বিধি-ব্যবস্থা নিন্দনীয় হবে কেন ? মানুষ মাত্রেই বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা আছে।

মুসলমান মালিকের কাছে দাসী তার নিজস্ব নারী, যেমন দাসীর কাছে তার মালিক নিজস্ব পুরুষ। মালিক-দাসীর এই সম্পর্কের মধ্যে আজাদ সাহেব শুধু মালিকের দিকটা দেখেছেন, দাসীর দিকটা দেখেননি। দাসীরও জৈবিক চাহিদা আছে, যা পূরণের জন্য একটা বৈধ পন্থা তার অবশ্যই দরকার। দাসীরও মা হওয়ার অধিকার আছে। দাসীও মানুষ এবং তাকে মানবিকভাবে বাঁচতে দিতে হবে। মুসলিম সমাজে মালিক-দাসীর একান্ত সম্পর্ক এইসব মৌলিক বিষয়ের জবাব মাত্র। এতে মালিক-দাসী উভয় দিকের সমস্যারই সমাধান আছে আর আছে সমাজ ব্যভিচারমুক্ত রাখার চাবিকাঠি। মালিক-দাসীর মাঝে ভালবাসার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা পরিণতিতে

www.pathagar.com

বিবাহের রূপ লাভ করে। এরকম বিবাহ একমাত্র মুসলিম সমাজেই সম্ভব। দাস-দাসী বলতে মুসলমানরা যা বুঝে থাকে অমুসলিমরা তা বোঝে না। মতের পার্থক্যটা সেখানেই।

ইসলামে দাসীর অবস্থান নিয়ে অমুসলিমরা এমনভাবে প্রশ্ন তোলে যেন তারা সবাই সাধু পুরুষ। যেন কেউ ভুলেও কখনও নারী ব্যবহার করেনি, ব্যভিচার তো করেইনি। কিন্তু বাস্তবে কি হয়, নারী নিয়ে কী তারা করে সেটা দুনিয়ার তাবৎ মানুষ জানে। ক্যাসিনো, সেক্স রুম, ইয়োথ ক্লাব, নাইট ক্লাব, ন্যুড ক্যাম্প, সেক্স ওয়ার্কার, রেড-লাইট এরিয়া, লিভিং টুগেদার, গার্ল ফ্রেন্ড, বয় ফ্রেন্ড, ডেটিং, ফান ইত্যাদির মানে কী সেটাও ছেলে-বুড়ো সবাই জানে। কোন কোন দেশের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বা পার্লামেন্ট ভবনে একটি বিশেষ অঙ্গাবরণীর মেশিন কেন বসানো হয় তাও কারও অজানা নয়। কোন্ দেশে অবিবাহিতা মায়ের সংখ্যা কত, কোন্ দেশে কত লোক পিতার নাম বলতে পারে না, কোন দেশের কোন মেয়েই সারা জীবন অধর্ষিতা থাকে না সেটা এখন আর কোন গোপন বিষয় নয়। তথাপি ওই সব দেশের সব চেয়ে ষন্ডামার্কা লোকগুলোই এক হাতে মদের বোতল আর অন্য হাতে বেগানা কোন নারী জাপটে ধরে খটাশ করে প্রশ্ন ছুঁড়ে মারে, 'ইসলামে কেন দাসী হালাল ?' মানে বেগানা নারী নিয়ে তারা নিজেরা যা-ই করুক সেটা দূষণীয় নয়, ইসলামে দাসী হালাল হওয়াটাই দূষণীয়। মনে হয় এদের লক্ষ্য করেই আল-কোরানে একাধিকবার বলা হয়েছে যে, তারা পশুর চেয়েও কম বুদ্ধি সম্পন্ন, জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট। অমুসলিমদের ওই বেহুদা প্রশ্নের সাথে যদি কেউ চালুনীর পক্ষে সূঁইয়ের ছিদ্র অন্বেষণের তুলনা করতে চান তো করতে পারেন, কিন্তু ইসলামের দাস-দাসী সংক্রান্ত রীতিনীতি সূঁইয়ের ছিদ্রের মতও ছিদ্র নয়। ওটা বরং মেরামত বা ঝাঁলাই এবং ব্যবস্থাটা মালিক পক্ষের চেয়ে দাস-দাসীর জন্য বেশী উপকারী। প্রসঙ্গটা বুঝতে হলে দাস-দাসী বলতে ইসলামে কী বুঝানো হয়, কারা মুসলিম সমাজে দাস-দাসী এবং ইসলামী সমাজে দাস-দাসীর জীবন কেমন সেটা বুঝতে হবে আগে । তাই এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রণিধানযোগ্য ঃ

১. মুসলিম সমাজের দাস-দাসী প্রধানতঃ যুদ্ধবন্দী। মুসলমানদের হত্যা করে তাদের ভূমি ও নারী-শিশু যারা কব্জা করতে চায় এবং আল্লাহ্‌র দুনিয়ায় যারা অশান্তি কায়েম করে শির্ক কুফরী ও অশ্লীলতার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায় সেই সব নরপশুর হিংস্র ছোবল থেকে নিজেদের নারী-শিশু-ভূমি রক্ষার্থে, আত্ম-রক্ষার্থে এবং সর্বোপরি আল্লাহ্‌র দ্বীন রক্ষার্থে মুসলমানরাও যুদ্ধ করে।

www.pathagar.com

যুদ্ধে হার-জিত আছে, মারণ-মরণ আছে, উভয়পক্ষে যুদ্ধ বন্দীও আছে। অমুসলিমরা মুসলিম বন্দী পেলে অপমানজনকভাবে নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে হত্যা করে ; বন্দীনি পেলে পাইকারী হারে প্রকাশ্য অপমান ও ধর্ষণের মাধ্যমে হত্যা করে। পক্ষান্তরে, মুসলমানদের হাতে অমুসলিমরা বন্দী হলে (ব্যতিক্রমী ব্যক্তির জন্য ব্যতিক্রম ছাড়া) তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে, নিজেদের মাঝে বন্টন করে নিয়ে তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে এবং তাদের দিয়ে যার যার সামর্থ অনুযায়ী কাজ করায়। বন্দীনিকে মালিক স্ত্রীর মত ব্যবহার করে, ভরণ-পোষণ দেয়, বস্ত্র আর বাসস্থানের ব্যবস্থা করে, অন্য পুরুষের দৃষ্টি আর ছোবল থেকে তাকে রক্ষা করে। যুধ্যমান দু'টি দলের মাঝে কোন্ দলের ব্যবহার উত্তম তা স্পষ্টতঃ দৃশ্যমান। ইসলামে অসম্ভব কল্পনা আর অসম্ভব কোন ব্যবস্থা নেই। একজন যুবকের কাছে একজন যুবতীকে ঘরোয়া পরিবেশে অবারিত অবস্থায় ছেড়ে দিলে পাপ কর্ম সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে প্রকৃতির স্বাভাবিক বিধানের মত। সে কারণেই একটা নির্দিষ্ট বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে উভয়কে উভয়ের জন্য হালাল করা হয়েছে বলে মনে করা যায়, এতে আল্লাহ্‌র অসীম দয়ার দিকটাই প্রকট হয়ে উঠেছে। ইসলামে কোন রকম অশ্লীলতা বা নিষ্ঠুরতা হালাল নয় বলে যুদ্ধ-বন্দিনীর উপর কোন 'পাইকারী ব্যবস্থা' প্রয়োগ করা হয় না। নারী হত্যা ইসলামের রীতি নয় বলে যুদ্ধ-বন্দিনীদের কাউকে হত্যা করা হয় না, তবে কাসাস বা হত্যার বদলে হত্যা ভিন্ন বিষয়। যুদ্ধ বন্দীর প্রতি কোনরূপ অসদাচরণ বা দুর্ব্যবহার ইসলামের রীতি-বিরুদ্ধ। যুদ্ধবন্দীরা সব সময়ই মুসলমানদের কাছ থেকে সদয় ব্যবহার পেয়ে এসেছে। এটা ইসলামের একটি সাধারণ বিধান। এ কারণেই অনেক যুদ্ধ বন্দীই কখনও আর নিজ কওমে ফেরৎ যায়নি, বরং মুসলমান হয়ে মুসলমানদের মাঝেই ভাই-বোনের মত থেকে গেছে। কেউ স্বেচ্ছায় নিজ কওমে কখনও ফেরৎ গেছে এমন নজীর জানা নেই। বর্তমান বিশ্ব ইসলামের মূল ধারা থেকে এতটাই বিচ্ছিন্ন যে, ইসলামের এই উদারতা আজ অনেকে বুঝতেও পারবে না।

২. আর এক শ্রেণীর দাসী ছিল ক্রীতদাসী। বিভিন্ন অমুসলিম সম্প্রদায় মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে, চুরি-ডাকাতি-রাহাজানির মাধ্যমে অপহরণ করে নারী-পুরুষ-শিশু বাজারে বিক্রি করত (আজও করে, গোপনে)। বিক্রীত

www.pathagar.com

পণ্যের মধ্যে নারীরা হতো সবচেয়ে বেশী অত্যাচার-অনাচারের শিকার। প্রকাশ্য সমাজে দল বেঁধে আনুষ্ঠানিক অশ্লীলতা, ব্যভিচার, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদির শিকার হতো এসব নারী। ধনী পুরুষরা কিনে নিয়ে ভরত তাদের হারেম এবং নানা রকম অসামাজিক কাজে তাদের ব্যবহার করত, অতিথির মনোরঞ্জনও ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, অনেকেই এদের রূপ- যৌবন ব্যবহার করে কামাই করত প্রচুর কাঁচা পয়সা। রাজী না হলে জুটত কঠোর শাস্তি, ধর্ষণ-হত্যাও ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু কোন মুসলমানের হাতে পড়লে এসব অসহায় নারী মুক্তি পেয়ে যেত ওইসব অনাচার-অত্যাচার থেকে। উপরে বর্ণিত কোন অভব্যতাই যেহেতু মুসলমানদের জন্য হালাল নয়, সেহেতু মুসলমান মালিক পেলে ক্রীতদাসীরা বরং খুশী হতো, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত হওয়ায় সুখীই হতো ; মালিক যেহেতু স্বামীর মতন সেহেতু তাদের মনোদৈহিক চাহিদাও মিটত স্ত্রীদের মতনই। অমুসলিম জগতের দাসী আর মুসলিম জগতের দাসীর মাঝে পার্থক্য এটাই। নর-নারীর বৈবাহিক সম্পর্কের মতই সমান্তরাল মুসলিম সমাজের এই মালিক-দাসীর সম্পর্ক। জী, হালাল।

৩. কাউকে দাসী হিসেবে গ্রহণ করাও এক ধরনের বিবাহ। সে কারণেই আল-কোরআনে যতবার স্ত্রী ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে প্রায় ততবারই দাসীর প্রসঙ্গও এসেছে এবং বিবাহের বিকল্প এবং/অথবা সম্পূরক হিসেবে দাসী ব্যবহার অনুমোদিত হয়েছে (দ্রঃ আল-কোরান, সূরা নিসা ঃ আয়াত ৩ ; সূরা মু'মিনুন ঃ আয়াত ৬)। বিবাহের মাধ্যমে দাসীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার কথাও বলা হয়েছে। দাসীর সম্মানও সমাজে স্বীকৃত – মালিকের সম্পর্কে সম্পর্কিত ব্যক্তি-বর্গের সাথে তার সম্পর্কও অনুরূপ হয়ে থাকে। সে কারণেই পিতার দাসী কখনও পুত্রের জন্য বা পুত্রের দাসী কখনও পিতার জন্য হালাল হয় না। দাস-দাসীদের বিবাহের ব্যবস্থা করাও মালিকের দায়িত্ব হিসেবে ইসলামে গণ্য করা হয়েছে (দ্রঃ আল-কোরান, সূরা নূর ঃ আয়াত ৩২)। পুণ্যলাভের আশায় অথবা কোন পাপের কাফফারা হিসেবে মালিক দাস-দাসী মুক্ত করতে পারে। দাস-দাসীরা নির্ধারিত বা অনির্ধারিত শর্তেও নিজে থেকে মুক্ত হতে পারে যে ব্যবস্থা শুধু ইসলামেই আছে, অন্য কোন সমাজে দাস-দাসী কখনও মুক্ত হয় না। আবার দাস-দাসীরা তাদের মুক্তির জন্য মালিকের

www.pathagar.com

সাথে চুক্তিবদ্ধও হতে পারে, লিখিত চুক্তিও করতে পারে। এ ব্যাপারে কোন দাস-দাসী চুক্তি করতে চাইলে সে চুক্তি করা মালিকের জন্য ফরজ হয়ে যায় যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ্ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন (দ্রঃ আল-কোরান, সূরা নূর ঃ আয়াত ৩৩)। মুক্ত করা দাস-দাসীকে অর্থ-সম্পদ দান করাও মালিকের যথাসামর্থ দায়িত্বের মধ্যে পড়ে (দ্রঃ আল-কোরান, সূরা নূর ঃ আয়াত ৩৩) যা আর কোন সম্প্রদায়ের মাঝে নেই।

অমুসলিম শিক্ষা-দীক্ষায় বিনষ্টীকৃত অনেক অশিক্ষিত মুসলমান অমুসলিমদের মতই প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, দাসীকে স্ত্রীর মত ব্যবহার না করেও তো মুসলমানরা তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে পারত। তা তো বটেই ! কিন্তু মুসলমানদের এতটা দায় কেন পড়ল যে, তারা তাদের শত্রু পক্ষের ভরণ-পোষণ যোগাবে ? যারা দয়া করে তাদের সমূলে বিনাশ করার জন্য, হত্যা করার জন্য মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ বাধাল, তাদের সেই সব জানের শত্রু, প্রাণের শত্রুকে অথবা তাদের নারী-শিশুকে তারা মাগনা খাওয়াবে-পরাবে কেন ? গরজটা কিসের ? মুসলমানদের এতটা বোকা মনে করার কারণটাই বা কী ? অমুসলিমরা তাদের নাগালে যত নারী-শিশু পাবে ইচ্ছামত তাদের ব্যবহার করতে পারবে, হত্যাও করতে পারবে, আর মুসলমানরা নিজেদের দাসীও স্পর্শ করতে পারবে না ? পাপ হবে ? লক্ষ জনের সাথে লক্ষ বার হারামীতেও যাদের পাপ হওয়ার কোন বিধান নাই, তারা নির্ধারিত নিজ দাসীর সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক নিয়ে কোন প্রশ্ন তুলতেই পারে না। বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে ঘরে বসার আগে নিজেদের দ্বীন-ধর্মের ব্যাপারে সাধারণ একজন চাষার জ্ঞানও অন্ততঃ আয়ত্ত করা তাদের উচিৎ ছিল।

আল্লাহ্ পাক নিজ নিজ অধিকারভুক্ত দাসী কেন মালিকের জন্য হালাল করেছেন তা জানেন একমাত্র আল্লাহ্। তবে এই ব্যবস্থায় দ্বীন-দুনিয়ার এবং মালিক-দাসীর কি কি উপকার হয়েছে তার একটা অসম্পূর্ণ তালিকা মানুষ করতে পারে। যথা ঃ

১. হারামী বা অশ্লীলতা থেকে নর-নারী মুক্ত থাকতে পারে। একই ঘরে বাস করা মালিক-দাসীর মাঝে ব্যভিচার সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারটি একেবারে উন্মুক্ত থাকত যা এই হালাল ব্যবস্থার মাধ্যমে বন্ধ হয়ে গেল।
২. মোহরানা আদায় করে বিবাহের যার সামর্থ নাই সেও নারীসঙ্গ পেতে পারে।
৩. ভাগ্যচক্রে দাসী হয়ে যাওয়া নারীও পুরুষ সঙ্গ পেতে পারে। মরুভূমিও বৃষ্টি কামনা করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

www.pathagar.com

৪. মালিক-দাসীর মাঝে একটা ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হয় যা উভয়ের জন্য কল্যাণকর। ভালবাসার সম্পর্ক না হলে এক ছাদের নিচে মানুষ বাস করে কি ভাবে ?

৫. মালিক-দাসীর ঘরও সত্যিকার অর্থে ঘর হয়ে উঠতে পারে।

৬. পিতার ঘর, স্বামীর ঘর হারানো দাসী একজন সর্বস্বান্ত নারী। যে কারণেই হোক সবহারা হয়েছে সে। স্বাভাবিক জীবনে ফেরার জন্য তারও দরকার ঘর, দরকার পুরুষ, দরকার শিশু। সবই সে পায় মালিকের কাছে, নতুন পরিবেশে, নতুন ভাবে। ঘর-বর-সন্তান আর জীবনের স্বাভাবিক নিশ্চয়তা কে না চায় ? ইসলামী শরীয়াহ্ তাকে এই অধিকারটিই ফিরিয়ে দিয়েছে। বোকা ছাড়া এ ব্যবস্থায় আর কে প্রশ্ন তুলতে পারে ?

৭. দাসী তার পিতার ঘর বা স্বামীর ঘর হয়ত ফেলে এসেছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। হয়ত সে ঘর আজ বহু বহু যোজন দূরে যেখানে সে আর কখনও ফিরতে পারবে না ; ফিরতে পারলেও হয়ত সে আর তার সেই প্রিয়জনকে ফিরে পাবে না। হতে পারে সে নিহত হয়েছে বা মারা গেছে অথবা নিরুদ্দেশ হয়েছে অথবা সেও আজ কোথাও দাসত্বের নিগড়ে বন্দী। এমন একজন অসহায় নারীর জীবনে ইসলামের ব্যবস্থা অবশ্যই আশীর্বাদ, যা অমুসলিমদের ধারণায়ও আসে না।

৮. মালিক-দাসীর সম্পর্ক হালাল হওয়ার কারণে সমাজে তারা নিন্দনীয় হয় না, তাদের কোন কিছু লুকিয়েও ফিরতে হয় না। তাদের সন্তানরাও সমাজে স্বাভাবিক স্বীকৃতি পায়। অবশ্যই মুসলমান হিসেবে।

৯. এ ব্যবস্থায় দাসীর গর্ভধারণ ক্ষমতার সদ্ব্যবহার হয় এবং দুনিয়ায় মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যা মূলতঃ সক্ষম নারীর সংখ্যার উপর নির্ভরশীল।

১০. দাসীর গর্ভজাত সন্তানরা জীবনের নিশ্চয়তা পায় যা অমুসলিম ব্যবস্থায় কখনও হয় না, বরং তারা জন্মের সাথে সাথেই গুপ্ত হত্যার শিকার হয়।

১১. দাসী ও তার সন্তানরা সম্পত্তির অধিকার পায়। এ সম্পদ উত্তরাধিকার নয়, মালিকের দান বা অসিয়তকৃত সম্পত্তি (দ্রঃ আল-কোরআন, সূরা নূরঃ আয়াত ৩৩) অথবা মৃতের সম্পত্তি বন্টনকালে উত্তরাধিকারী না হওয়া সত্তেও উপস্থিত এতিম আত্মীয় বা মিসকিনকে প্রদত্ত সম্পত্তি (আল-কোরআন, সূরা নিসাঃ আয়াত ৮)। বলা বাহুল্য যে, অন্যান্যদের মত মৃত ব্যক্তির ঔরসে তার

www.pathagar.com

দাসীর গর্ভজাত সন্তানও এই শ্রেণীর এতিম আত্মীয়ের পর্যায়ে পড়ে এবং তাকে দান করার বিষয়টিও অবহেলা করা যাবে না, যেহেতু নির্দেশটি আল-কোরআনে প্রদান করা হয়েছে। আল-কোরআনে প্রদত্ত সব নির্দেশ ফরজ শ্রেণীভুক্ত।

১২. দাসীর গর্ভজাত সন্তানরা মুসলমান হওয়ার কারণে মুক্ত মানুষ। তারা দাস-দাসী হয় না। দাসী-পুত্ররাও মুসলমানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে, সামাজিক কাজেও তারা সমানভাবেই অংশ নেয়। তারাও হয় সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। অর্থাৎ- এই ব্যবস্থায় দাস প্রথা অমুসলিম বিশ্বের ব্যবস্থার মত চক্রবৃদ্ধিহারে স্থায়িত্ব পায়নি।

এ তালিকায় আরও অনেক বিষয় যোগ করা যাবে যাতে বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি পাবে। হাজার ভাবে প্রমাণ করা যাবে যে, ইসলামে মালিক-দাসীর হালাল সম্পর্কের মাঝে উভয় পক্ষেরই কল্যাণ আছে এবং দ্বীন-দুনিয়ারও অনেক কল্যাণ ও ভালাই আছে। যুবতী নারী অমুসলিমদের হাতে পড়লে হয়ে ওঠে দুনিয়া-বিধ্বংসী লেলিহান আগুন ; মুসলমানদের হাতে পড়লে হয়ে ওঠে ফুল-ফল ভর্তি বাগান অথবা স্বচ্ছতোয়া নদী। হুমায়ুন আজাদরা এ ব্যবস্থার যত নিন্দা করবেন তাঁদের অজ্ঞতার বেসাতি ততই প্রকট হয়ে দেখা দেবে। সবচেয়ে বড় কথা হ'ল, ইসলামের এই সুন্দর ব্যবস্থাটি সম্পর্কে তাঁর কোন জ্ঞানই ছিল না, যে কারণে স্বয়ং রাসূল (সঃ) এর নিন্দা করতেও তাঁর অন্তর কাঁপেনি। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন এবং উপযুক্ত জ্ঞান দান করুন এই প্রার্থনা করছি।

গোঁড়া অবিশ্বাসী আর উগ্রপন্থী যৌগবাদী কখনও হার মানে না। মূর্খের অভিধানে 'হার' শব্দটি অন্যের জন্য থাকলেও নিজের জন্য নাই। এই 'চিরজয়ী' শ্রেণীটা যুক্তিশাস্ত্রের বিধান মানেও না, বোঝেও না। চরম প্রাকৃতিক সত্যও তারা গপাস করে গিলে ফেলে বলে, 'নেই।' এক সাথে গোটা দশেক মিথ্যের জন্ম দিয়ে বলবে, 'এগুলোই সবচেয়ে বড় সত্য।' তারা না পারে হেন নোংরামী নেই। সে কারণেই আশঙ্কা হয় যে, পুরুষরা দাসী ব্যবহার করতে পারলে নারীরা দাস ব্যবহার করতে পারবে না কেন মর্মে এখনই হয়ত একটা বড় ইস্যু সৃষ্টি করে বসবে। দৃষ্টি-প্রতিবন্ধীদের চোখে পড়ে না যে, নারীরা ব্যবহার করে না, বরং ব্যবহৃত হয় এবং ধর্ষণ বলে একটা জিনিস আছে যা কোন ভদ্র নারীই কখনও কামনা করে না। বিজাতীয় দাস মুসলিম নারীদের ব্যবহারের সুযোগ পেলে সেটা নারীদের উপর হবে পরাজিতের মরণ-কামড়, ধর্ষণ বা নারী-নির্যাতন। আর

www.pathagar.com

এই সুযোগ তাদের জন্য বিজয়ী মুসলমানরাই করে দেবে এমন অপগন্ড ব্যবস্থার কথা যারা ভাবতে পারে তাদের ব্যাপারে কথা বলতেও ঘৃণা হয়। এসব লোক বোকার পর্যায়েও পড়ে না। বোকার বোকামীরও একটা মাত্রা থাকে ; কিন্তু এদের কোন মাত্রা নেই। সে কারণেই তারা বলে থাকে যে, নর-নারীর মাঝে কোন পার্থক্য নেই ; নর যা পারে, নারীও নাকি তা পারে। তারা গর্ভাধান এবং গর্ভধারণের মাঝে কোন পার্থক্য দেখে না। এদের ব্যাপারে আর কথা না বাড়ানোই বরং ভাল।

বিয়ে মানে বিয়ে

ইসলামে বিবাহ মালিক-শ্রমিকের মধ্যকার চুক্তির চেয়েও ভয়াবহ এক চুক্তি বলে ডঃ আজাদ ঘোষণা করেছেন ('নারী', তৃতীয় সংস্করণ, পঞ্চদশ মুদ্রণ, আগামী প্রকাশন, পৃঃ ৮৫)।। পুরুষকে মালিক আর নারীকে শ্রমিক বলেছেন। নারীর সমস্ত অধিকার বিয়েতে হরণ করা হয় এবং পুরুষকে সমস্ত অধিকার দেয়া হয় বলে তিনি দাবী করেছেন। কিন্তু কোন বিবাহিত মুসলমান নর-নারী আজাদ সাহেবের এই তিনটা অভিযোগের একটাও সত্য বলে মনে করতে পারবে না। কারণ ঃ

১. ইসলামে বিবাহ কোন চুক্তি নয়। কন্যার মুখে 'বিবাহ কবুল করলাম,' কনে পক্ষের নির্ধারিত অভিভাবকের মুখে 'বিবাহ দিলাম' আর বরের মুখে 'বিবাহ করলাম' এবং তারপর মৌলভী সাহেবের দরূদ পাঠ ও বর-কনের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য মঙ্গল কামনায় মোনাজাত শেষে সবার মাঝে মিষ্টি বিতরণ, সংক্ষেপে এই হোল ইসলামী বিবাহ। এর মাঝে চুক্তি কোথায় ? বাংলাদেশে কাবিন নামা বলে চুক্তির মত একটা জিনিস প্রচলিত আছে, কিন্তু সেটা ইসলামী শরীয়াহ্‌র অঙ্গ নয়, পাকিস্তান আমল থেকে প্রচলিত একটা আইনী বস্তু। ওর সাথে ইসলামের সম্পর্ক নাই, সম্পর্ক আছে রাষ্ট্রীয় আইনের। রাষ্ট্রীয় আইনের দায় ইসলামী শরীয়াহ্‌র উপর চাপানো অন্যায়।

www.pathagar.com

২. বিবাহের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় স্বামী-স্ত্রী। একজন সংসারের মালিক, অন্য জন মালিকা। এর মাঝে মালিক-শ্রমিক কোথায় ? কোন কোন সংসারে হয়তো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মালিক-শ্রমিকের মত হয়ে যায়, কিন্তু সেটা কেন হয় তা তদন্ত করলেই দেখা যাবে যে, ইসলামী বিধি-বিধান না মেনে ওইসব সংসারে বিজাতীয় রীতি-নীতি চালু করা হয়েছে। এই অপকর্মের দায় ইসলাম কেন নেবে ? ইসলামী শরীয়াহ্ মান্য করা হয় এমন কোন সংসারে তো আমরা স্বামী-স্ত্রীই দেখতে পাই, অন্য কিছু তো দেখা যায় না। বিজাতীয় সংস্কৃতির কারণে তো আবার উল্টাটাও দেখা যায় যেখানে স্ত্রী হয়ে যায় মালিক পক্ষ আর স্বামীটি হয়ে পড়ে আজ্ঞাবহ দাস। এই দুই মেরুর কোনটার দায়ই ইসলাম নেবে না। ইসলাম সরল পথ আর সহজ ব্যবস্থার দ্বীন।

৩. ইসলামী বিবাহে কেউ অধিকার হারায় না ; নারীও না, পুরুষও না। নারীর সমস্ত অধিকার কেড়ে নেয়া হয় কিভাবে ? সমস্ত অধিকার বলতে আজাদ সাহেব কী বোঝাতে চাচ্ছেন তা পরিষ্কার নয়। আমরা তো দেখি বিয়ের মাধ্যমে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, যৌনতা, সন্তান, সম্পত্তি, আত্মীয়তা ইত্যাদি কোন কিছুই মুসলিম নারী হারায় না ; বরং বিবাহ-পূর্ব জীবনের চেয়ে এগুলোর অধিকার তার আরও প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য স্বামীর শক্তি-সামর্থ্য একটা বড় বিষয়। স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ীই স্ত্রীর পাওনা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়। ধনীর স্ত্রী ধনীর মতই ব্যয় করে আর গরীবের স্ত্রী গরীবের মত জীবন যাপন করে। কিন্তু সেটা কি শুধু স্ত্রীর একার ব্যাপারে প্রযোজ্য, স্বামীর ব্যাপারে প্রযোজ্য নয় ? অবশ্যই।

উল্লিখিত তিনটা যুক্তির একটাও ভুল নয়। ইসলাম এবং ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে যার ধারণা নেই তার পক্ষেই সম্ভব উল্টাপাল্টা কথা বলা। শরীয়াহ্ সম্পর্কে কথা বলার আগে শরীয়াহ্ সম্পর্কে জানা উচিৎ ছিল।

কুতার্কিক হয়ত তার পরেও প্রশ্ন তুলবে যে, বিবাহে নারীকে মোহরানা দেয়া হয় কেন। উত্তর একটাই। নারীর সম্মান। তাঁর সতীত্বের সম্মান। জীবনকে যারা অর্থের মাপে পরিমাপ করে তারা অনেক কিছুই ভুল দেখে, অনেক কিছুরই অপব্যাখ্যা করে। এদেশে এক সময় কনে দেখে বরপক্ষ টাকা দিত। সসম্মানেই দিত। একটা সুন্দর বর্তন, নিদেন পক্ষে একটা সোনালী পানদানে করে কেউ এক জন কনের সামনে ধরত ; টাকাটা

www.pathagar.com

দিতো বরপক্ষের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তির হাত দিয়ে। পাশ থেকে কেউ হয়ত বলতো, 'নেও মা, নেও, লজ্জা কী !' যে-কোন মানুষই বলবে যে, মেয়েটিকে তারা সম্মান করেছে। কিন্তু এ যুগের নারীবাদীরা বলবে মেয়েটিকে অসম্মান করা হয়েছে। বড় আজব নারীবাদীদের এই নীচ মন আর হীন দৃষ্টিভঙ্গি। উপযুক্ত শিক্ষা আর সংস্কারের অভাবে সবকিছুর মাঝেই তারা কেনাবেচা দেখে। পিতা-মাতার সাথে সন্তানের সম্পর্কের মাঝেও তারা অর্থ আর স্বার্থ টেনে আনে। তারা অর্থশাস্ত্র খুব ভাল করে পড়েছে, বিপরীতে ইসলাম বা মানবশাস্ত্র পড়ার সুযোগ পায়নি, কারণ ওটা সিলেবাসে ছিল না।

রূপকাহিনীর চারটি বউ

'নারী' গ্রন্থে মুসলমানদের চার বউ নিয়ে বলতে গেলে একটি গদ্য গাথাই রচিত হয়েছে। লেখক এত বেশী নিন্দা, ক্ষোভ আর আফসোস ব্যক্ত করেছেন যে, প্রত্যেক পাঠকেরই মনে হবে যেন প্রতিটি মুসলমানের ঘরে চারটি করে বউ আছে, বউগুলো নিয়ে রাত-দিন প্রত্যেকেই অবিশ্রাম 'শোয়া'য় ব্যস্ত থাকে, মুসলমান পুরুষের বুঝি আর কোন কাজই নেই এবং বউগুলো অর্থাৎ- প্রতিটি মুসলিম মেয়ে দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টা একেবারে হা-পিত্যেস কামার্ত-ক্ষুধার্ত থাকে, যেহেতু প্রত্যেক মুসলিম নারীর ভাগে পড়ে মাত্র 'এক-চতুর্থাংশ স্বামী' ('নারী', তৃতীয় সংস্করণ, পঞ্চদশ মুদ্রণ, আগামী প্রকাশন, পৃঃ ৮৭)। চার চারটি নারীর 'প্রচন্ড কাম ভোগ' করে করে ('নারী', তৃতীয় সংস্করণ, পঞ্চদশ মুদ্রণ, আগামী প্রকাশন, পৃঃ ৮৭) মুসলিম পুরুষগুলোর মনে হয় একেবারে লবেজান অবস্থা। অবাস্তব কল্পনা আর বুদ্ধির অভাব একেই বলে।

ইসলামে বহু বিবাহের ব্যবস্থা আছে, তবে সেটি অন্যান্য ধর্মের মত লাগামহীন নয়, বরং সীমিত। সর্বোচ্চ চারটি, যা অন্য কোন ধর্মে নির্ধারিত নেই। বিশ্বের সব ধর্মেই বহু বিবাহের স্বীকৃতি আছে এবং ছিল। রাজা দশরথের চার স্ত্রী, শ্রীকৃষ্ণের আট জন পত্নী + অগণিত উপ-পত্নী, রাজা অর্জুনের বহু স্ত্রী, মানসিংহের বহু স্ত্রী, রাবণের ১০০০ স্ত্রী,

www.pathagar.com

রাজা ডেভিডের[১৫] ১০০ স্ত্রী, রাজা সলোমনের ১০০০ স্ত্রী ছিল। এসব ঐতিহাসিক ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, অন্যান্য ধর্মে বহু বিবাহের ব্যবস্থা রয়েছে। ইসলামে বরং সেটিকে সীমিত করে সর্বোচ্চ চার জন রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথচ অন্যান্য ধর্মের লোকই আগ্রাসী কায়দায় প্রশ্ন করে, 'ইসলামে কেন একাধিক বিবাহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে?' এ ব্যাপারে আমাদের জবাব একটাই, ইসলামে তো একটা সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে, তোমাদের তো সে সীমাটিও নাই। ধর্মহীনদের তো বিবাহেরও দরকার নেই, তারা তো সবাই সবার। তারপরও যে তারা ইসলামের উপর ক্ষিপ্ত তার কারণ ইসলাম ওই পশুর জীবন অনুমোদন করে না, অন্যান্য ধর্মের লাগামহীন বহুবিবাহও ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলামে সবকিছুই কম-বেশী নিয়ন্ত্রিত। যে বহু বিবাহের প্রথা অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে একেবারে সব সমাজে, সেই প্রথাকেই কোরআন পরবর্তী ইসলামে নিম্নলিখিত আয়াতে প্রায় বাতিলই করে দেয়া হয়েছে ঃ " আর ইয়াতিমদেরকে তাদের মাল-সম্পদ ফেরৎ দিয়ে দাও, ভাল মাল খারাপ মালের সাথে বদল করো না এবং তাদের মাল তোমাদের মালের সাথে মিলিয়ে হজম করে ফেল না। অবশ্যই তা হবে কবীরা গুণাহের কাজ। আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতিমদের ব্যাপারে সুবিচার করতে পারবে না, তবে তোমাদের পছন্দনীয় স্ত্রীলোকদের মধ্য হতে বিয়ে করে নাও দুই জন বা তিন জন বা চার জন। তবে যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ন্যায়বিচার করতে পারবে না তবে এক জন অথবা তোমাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে(অর্থাৎ-দাসী)।" (আল-কোরআন, সূরা নিসা ঃ আয়াত ২-৩)

এ আয়াত নাজিল হয়েছিল ওহুদের যুদ্ধের পর, মুসলমানরা যখন ইয়াতিম ও বিধবা নিয়ে সমস্যা জর্জরিত ছিল। ৭০ জন মুজাহিদ শহীদ হওয়ার অর্থ হ'ল ৭০ টি পরিবার অনাথ হওয়া। আর এ কারণে সমাজে অন্যায়, অবিচার ও ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়তে পারত। ছড়িয়ে পড়তে পারত বেশ্যাবৃত্তিও। এ অবস্থা দূর হয়েছে আল্লাহ্‌র এ নির্দেশের প্রেক্ষিতে। অর্থাৎ- সমাজে নারীর সম্মান ও অবস্থান মজবুত হওয়াই এ আয়াতের অন্যতম ফসল। উপরন্তু, এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, ইসলামে বহু বিবাহের বিষয়টি লাইসেন্স নয়, নিয়ন্ত্রণ। উভয় আয়াত মিলিয়ে যা দাঁড়ায় তা হ'লঃ

---

[১৫] ইহুদী ও খৃষ্টানরা হযরত দাউদ (আঃ) কে ডেভিড এবং হযরত সোলায়মান (আঃ) কে সলোমন বলে থাকে। তাদের ভাষাই রাখা হ'ল যাতে নিজেদের লোক তারা সহজে চিনতে পারে।

www.pathagar.com

"এ কথা লক্ষ্য করার বিষয় যে, একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়ার জন্য এ আয়াত নাজিল হয়নি। কারণ এ আয়াত নাজিল হবার পূর্ব থেকেই তা বৈধ ছিল এবং রসূলে করীমের (সঃ)-ও সে সময় একাধিক বিবি বর্তমান ছিলেন। আসলে যুদ্ধে শহীদদের এতিম সন্তান-সন্ততির সমস্যা সমাধানের জন্য এ আয়াত নাজিল হয়েছে যে, যদি তোমরা এমনিতেই ইয়াতিমদের হক আদায় করতে না পার, তবে তোমরা সেই স্ত্রীলোকদের বিবাহ কর যাদের কাছে এতিম সন্তান-সন্ততি রয়েছে।" [১৬]

(শব্দার্থে আল-কোরআন, অনুবাদক ঃ মতিউর রহমান খান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২য় খন্ড,পৃঃ ৯, টীকা-১।)

``*An-Nisa*, ``Women", is so-called because it deals largely with women's rights. The period of revelation is the months following the battle of Uhud....Many Muslims were killed at the battle of Uhud, hence the concern for orphans and widows in opening verses which lead on to a declaration of some rights of women of which they were deprived among the pagan Arabs."

(Muhammad Marmaduke Pickthal's comments on sura *Nisa* in *The Glorious Qur'an*)

বিষয়টা অত্যন্ত পরিষ্কার, কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। আর সূরা আন-নিসার ২-৩ আয়াতে উল্লিখিত সমতা বজায় রাখার শর্তটি বরং নিষেধাজ্ঞার মতই, যদিও সুরাটির শেষ দিকে এসে আবার বহু বিবাহের এই সমতার দিকটিকে ক্ষমার কথা বলা হয়েছে ঃ

"স্ত্রীদের মধ্যে তোমরা কখনও ন্যায়বিচার করতে পারবে না যদিও তোমরা তা করতে চাও। তবে তোমরা সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড় না যাতে একজনকে ফেলে রাখ ঝুলন্ত অবস্থায়। যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন কর এবং মোত্তাকী হও তবে আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল , পরম দয়ালু।" (আল-কোরআন, সূরা আন-নিসা, আয়াত ঃ ১২৯)

সব মিলিয়ে ব্যাপার একটাই দাঁড়ায় – ইসলাম আসলে বহু বিবাহের ঢালাও অনুমতি দেয়নি, সমতার স্বার্থে নিরুৎসাহিত করেছে; কিন্তু দরকারী ক্ষেত্রে ওটির ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। অবিশ্বাসীরা অবশ্যই না বোঝার ভাণ করে প্রশ্ন করবে যে, দরকারটা আবার কি ? এর উত্তরে অনেক কথাই বলা যায়। তবে প্রথম উত্তরটা হ'ল তারা নিজেরা যে দরকারে বহু নারীগমন করে বা বহু বিবাহ করে থাকে। মুসলমানরা আল্লাহ্র নির্দেশ

---

[১৬] আয়াত দুটি যদিও ইয়াতিমদের সাথে সংশ্লিষ্ট তথাপি এতিমের মা'দেরকেই শুধু বিয়ে করার কথা বলা হয়েছে একথা মনে হয় ঠিক নয়। যে-কোন নারীদের মধ্য থেকে ২ থেকে ৪ জনকে প্রতিজন পুরুষ বিয়ে করে নিলে তাতেই সমাজে অবিবাহিত স্ত্রীলোকের সংখ্যা কমে যাবে এবং তাতে ইয়াতিমের মায়েদের জন্যও এবং অন্যান্য বিধবাদের জন্যও বিবাহের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সমাজে অবিবাহিত নারীও থাকবে না, ইয়াতিমরাও অভিভাবকহীন থাকবে না। সম্ভবতঃ এটাই ছিল আয়াতটি নাজিল হওয়ার সময়কার প্রেক্ষাপট।

www.pathagar.com

পালনের ব্যাপারে তাদের মতামতের তোয়াক্কা করে না, তাদের এরূপ প্রশ্নেরও এখতিয়ার নাই। তথাপি, ইসলাম যেহেতু সব প্রশ্নের জবাব দিতে প্রস্তুত সেহেতু এ প্রশ্নেরও জবাব দেয়া মুসলমানের কর্তব্য। তাই নিম্নের কারণগুলি প্রণিধানযোগ্য ঃ

১. পৃথিবীর কোন জাতি মুসলমানদেরকে পছন্দ করে না। যেভাবেই হোক মুসলমানদেরকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারলেই তারা শান্তি পাবে বলে তারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। ফলতঃ আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ মুসলানদের জীবনে একটা অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। হযরত মুহম্মদ (সঃ)-কেও সারাজীবন যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হয়েছে। জীবনে তিনি যতগুলো যুদ্ধ করেছেন তার সবই ছিল আত্মরক্ষামূলক। অতি অল্প সংখ্যক ক্ষেত্রেই তিনি আগে আক্রমণ করেছেন, তারও একটি ক্ষেত্রে বিপক্ষ দল চুক্তি ভঙ্গ করে শত্রুদলের হয়ে যুদ্ধ করার পর এবং অন্যটিতে বিপক্ষ দল আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে বা আক্রমণ করবে এরকম খবর পাওয়ার পর। অর্থাৎ- তিনি সব যুদ্ধই করেছিলেন আত্মরক্ষার্থে। আজও মুসলমানরা আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়, যারা যুদ্ধ করে না তারা শুধুই মার খায়। আক্রান্ত হলে যুদ্ধ করতেই হয়। আর যুদ্ধে মারা পড়ে পুরুষ। ফলতঃ মুসলিম সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশী হয়ে থাকে। এ কারণেই পুরুষের বহু বিবাহ দরকার হয়ে পড়ে; নারীর জীবন, যৌবন এবং জীবিকার স্বার্থেই এটা দরকার।

২. মুসলিম সমাজে সব পুরুষ বিয়ে করতে পারে না। সবার অনুমতি নাই। নারীর মোহরানা আদায়, ভরণ-পোষণ এবং ইজ্জত-আব্রু রক্ষার সামর্থ্য যার নাই বিবাহের অধিকার তার নাই, তাঁকে রোজা রাখতে বলা হয়েছে (আল-কোরআন, সূরা নূর ঃ ৩৩ ; মুসলিম শরীফ, হাদীস নম্বর- ৩২৬৪, ৩২৬৬)। পক্ষান্তরে, সব নারী বিবাহের অধিকার রাখে। এ কারণেই মুসলিম সমাজে বিবাহযোগ্য পুরুষের তুলনায় বিবাহযোগ্যা নারীর সংখ্যা বেশী হয়ে থাকে। নারীর যৌবন পুরুষের তুলনায় আগে আসে, আগে যায়, কিন্তু নারী পুরুষের তুলনায় বেশী দীর্ঘায়ু। এ কারণেও সমাজে বিবাহযোগ্য পুরুষের তুলনায় বিবাহযোগ্যা নারীর সংখ্যা বেশী থাকে। ফলতঃ মুসলমান পুরুষের বহু বিবাহ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

৩. নারী যাতে সমাজে অসহায় হয়ে বেশ্যাবৃত্তির সূত্রপাত না করে সেহেতু বিত্তবানদের বহু বিবাহ পূণ্য কাজ বিশেষ। বলা বাহুল্য যে, অন্যান্য জাতি নানা উপায়ে ও নানা কৌশলে নারী জাতিকে বেকায়দায় ফেলে, অসহায় করে বেশ্যাবৃত্তিকে রীতিমত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে যা ইসলামে একেবারেই নিষিদ্ধ। মুসলিম সমাজে যতদিন বহু বিবাহ চালু ছিল, ততদিন বেশ্যাবৃত্তি ছিল না। কিন্তু যখনই অন্যান্য জাতির অনুসরণে মুসলমানরাও এক বিয়ের মধ্যে নিজেদেরকে সীমিত রাখতে শুরু করেছে এবং যার বিবাহের সামর্থ্য নাই তাকেও টাকা-পয়সা দিয়ে মেয়ে গছিয়ে দেয়ার মত জঘন্য প্রথা চালু হয়েছে তখন থেকেই ভিক্ষাবৃত্তি আর বেশ্যাবৃত্তিও সমাজে স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে। পূর্বে ইসলামী সমাজে ভিক্ষা বৃত্তি একটু আধটু থাকলেও পুরুষ ভিক্ষুকই দেখা যেত, নারী আর শিশু ভিক্ষা করত না। কিন্তু এখন করে। যার বউই থাকার কথা নয়, সেও এখন বউয়ের কামাই খায়, লোভের বসে ভিন্ন কাজেও লাগায়, বিক্রি করতে বা পাচার করতেও দ্বিধা করে না। বউ পোষার সামর্থ্য নাই অথচ পরিবারের মালিক, হয়ত এক-দেড় গন্ডা সন্তান, অভাবের কারণে পড়া-লেখার সুযোগ হয় না, প্রথমে ভিক্ষা, পরে চুরি-ডাকাতি হয় তাদের পেশা। এভাবেই অনিসলামিক পদ্ধতিতে নারীর বাড়তি উপকার করতে গিয়ে ক্ষতির শিকার হয়েছে মূলতঃ নারীই।

অর্থাৎ- ইসলামে বহু-বিবাহের স্বীকৃতি আসলে নারীর স্বার্থকেই সংরক্ষণ করেছে, আর এর বিরোধিতাই নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। সবচেয়ে বড় কথা হ'ল আধুনিক মুসলমানের ঘরে চারটি করে বউ নাই। কারও কারও ঘরে একটিও নাই। যদি থাকতই তা হলে অন্য ধর্মাবলম্বীরা কোন নারীই ভাগে পেত না। কারণ নারীর সংখ্যা দুনিয়ায় অত বেশী নাই। গড় হিসেবে সারা বিশ্বে এখনও পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা কম। প্রত্যেক মুসলমান যদি ২-৪ টা করে বিয়ে করত তবে পৃথিবীতে যত নারী আছে তাতে তো কুলাতই না, বরং কৃত্রিম উপায়ে নারী হয়ত কলে-কারখানায় সৃষ্টি করার ব্যর্থ চেষ্টায় মানুষ লিপ্ত হত। বিবাহের সুযোগ থাকলেই মানুষ বিয়ে করে এ ধারণা করাও বোকামী। কাজেই মুসলমানরা কেন চারটি করে বিয়ে করে এরূপ প্রশ্ন তোলাও সুবুদ্ধির পরিচয় নয়, বরং বিদ্বেষের পরিচয়। বোকামীর পরিচয়। বুদ্ধি-প্রতিবন্ধীরাই বাস্তব বিষয়গুলো দেখে না, দেখার যোগ্যতা রাখে না, তারা হিসেব না করেই কথা বলে আর গুজবকে সত্য মনে করে।

www.pathagar.com

এদেশের অনেক লোকই বলে থাকে যে, সৌদী আরবে প্রত্যেক পুরুষ চার-পাঁচটা করে বিয়ে করে। এই গাঁজাখুরী কথা বিশ্বাস করা যেত যদি নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় চার-পাঁচ গুণ বেশী হতো। কিন্তু নারী সংখ্যায় আজও পুরুষের তুলনায় কম। যখন যুদ্ধ ছিল তখন নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় বেশী ছিল। কিন্তু বর্তমানে একমাত্র প্যালেষ্টাইন, কাশ্মীর ও বসনিয়ার মত যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ ছাড়া আর কোন মুসলিম সমাজে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় বেশী নয়, বরং কম। কাজেই একেক জন পুরুষ চার-পাঁচটা করে বিয়ে করে এ কথা যেই বলুক সে বোকা, হিসেবে কাঁচা। বিষয়টা চাক্ষুষ। এত নারী তারা কোথায় পাবে ? খেজুর গাছে তো আর নারী জন্মায় না। লক্ষ জনের মাঝে হয়তো দু'একটা ঘরে দু'চারটা বউ থাকতেও পারে, কিন্তু সেটা কোন সাধারণ ঘটনা নয়। এদেশেও কারও ঘরে চার-পাঁচটা বউ নাই। শরীয়াহ্য় বিধান আছে একাধিক বিয়ে করা যাবে, কিন্তু একাধিক বিয়ে করতে হবেই এ বিধান শরীয়াহ্য় নাই। তবে ডঃ আজাদের 'নারী' পড়ে মনে হয়েছে যে, চারটি করে বিয়ে করা মুসলমানদের জন্য বুঝি ফরজ। নইলে প্রতিটি মুসলিম নারীর ভাগে এক-চতুর্থাংশ স্বামী আর প্রতিটি মুসলিম পুরুষের চার চারটি স্ত্রীর প্রচন্ড কাম ভোগ করার গল্প তিনি কোথায় পেলেন ? কারাই বা তাঁর এই গল্পে বিশ্বাস করে ? এ দেশের পাঠকরা কি আসলেই এত বোকা ! মনে হয় না।

www.pathagar.com

বেহেশত শুধু পুরুষের নয়

'নারী' গ্রন্থে লেখক বেশ জোরের সাথেই ঘোষণা করেছেন যে, মুসলমানের বেহেশত শুধু পুরুষের জন্য, পার্থিব নারী বা স্ত্রীদের সেখানে কোন স্থান নেই ('নারী', ৩য় সংস্করণ, ১৫শ মুদ্রণ, পৃঃ ৮৪)। বড় অবাক ব্যাপার ! কিন্তু আল-কোরআন এবং আল-হাদীস সাক্ষী, নারী বেহেশত হতে বিতাড়িত নয়। আল্লাহ্ কারুরই আমল বরবাদ করেন না, যার যার আমলের প্রাপ্য সে সে পাবে, তা সে নারীই হোক আর পুরুষই হোক (আল-কোরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াতঃ ১৯৫ ; সূরা আন-নিসা ঃ আয়াত ১২৪)। কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত ইসলামের এই অবশ্য পালনীয় বিষয়গুলো নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। পালন করলে পুরষ্কার এবং অবহেলা করলে শাস্তি, সবার জন্যই সমান। কোন পার্থক্য নাই। হযরত খাদিজা (রাঃ), হযরত ফাতিমা (রাঃ), হযরত আছিয়া (রাঃ), হযরত মরিয়ম (রাঃ), হযরত হাওয়া (রাঃ), হযরত হাজেরা (রাঃ), হযরত রহিমা (রাঃ) এর মত পুণ্যবতী রমণীগণ যে বেহেশতবাসিনী হিসেবে গণ্য এবং সুখবর প্রাপ্তা তা সবাই জানেন। এঁদের মত অন্যান্য পুণ্যবতী রমণীরাও বেহেশতবাসিনী হবেন বলে আল-কোরআন এবং আল-হাদীসে বার বার ঘোষণা করা হয়েছে। আল-কোরআন আজকাল বাংলায় পাওয়া যায়, আল-হাদীসও পাওয়া যায়। তাই উদ্ধৃতিদানের প্রয়োজন নেই।

একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, বেহেশতের অধিকাংশ বাসিন্দা গরীব লোক আর পুরুষ এবং দোযখের অধিকাংশ বাসিন্দা ধনী লোক আর নারী। হুমায়ুন আজাদ এই হাদীসকে পুঁজি করে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, বেহেশত পুরুষের, দোযখ নারীর। নিঃসন্দেহে তাঁর এই বিশ্লেষণ ভুল। প্রথমতঃ অধিকাংশ মানে সব নয়। দ্বিতীয়তঃ বেহেশতের বাসিন্দা গরীব লোক বলতে শুধু পুরুষকে বুঝায় না, ওর মাঝে নারীও আছে, আর সে কারণেই পুরুষের কথা আলাদাভাবে বলা হয়েছে। তৃতীয়তঃ দোযখের বাসিন্দা ধনী লোক মানে শুধু নারী নয়, ওর মাঝে পুরুষের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ ধনী লোকই পুরুষ। সে কারণেই নারীর কথাটা আলাদাভাবে বলা হয়েছে। আজাদ সাহেব সোজা কথাটা সোজাভাবে না নিয়ে অপব্যাখ্যা করেছেন। 'ধনী লোকের পক্ষে বেহেশতে যাওয়া সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উট যাওয়ার চেয়েও কঠিন।' এই

www.pathagar.com

হাদীসটি তিনি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন, পাঠককে ধোঁকা দিয়েছেন। কিন্তু ইসলামের বাণী খুব সোজা ঃ বেহেশত পুণ্য কাজের জন্য, দোযখ পাপ কাজের জন্য ; কর্মী নারী কি পুরুষ সেটা বিবেচ্য নয়। তবে অধিকাংশ ধনী লোক আর নারী পাপ কর্মে অভ্যস্ত, নিয়ম-কানুন মানতে নারাজ, বিলাস-ব্যসনে অতি ব্যস্ত ; অধিকাংশ ধনী লোকের ধনের উৎস অবৈধ বা হারাম। পক্ষান্তরে, পুণ্য কর্মে নিয়োজিত লোকদের অধিকাংশই গরীব আর পুরুষ যারা দুনিয়ার দুষ্ট নর-নারীকে 'বন্ধু' হিসেবে পায়নি বা নেয়নি। বেহেশতী আর দোযখীর পার্থক্য তাই দুনিয়াতেই পরিস্ফুট। একদল আল্লাহ্-রাসূলের নাম শুনলেই নত হয়, অন্য দল গোখরা সাপের মত ফোঁস করে ওঠে যেন ছোবল হানবে। একদল রিপুর তাড়না অবদমিত করে, অন্য দল পয়সা খরচ করে রিপুর সেবার জন্য রঙমহল বানায়, স্টেজ সাজায়, উত্তেজক পদার্থ সেবন করে। একদল হারাম বস্তু দেখলে ভিড়মি খেয়ে চোখে সর্ষে ফুল দেখে, অন্য দল হারাম বস্তু ছাড়া বাঁচতেই পারে না। একদল ছেঁড়া ন্যাকড়া পরে হলেও ইজ্জত-আব্রু ঢাকে, অন্য দল হাজার টাকার পোশাক পরে নগ্নিকা সাজে। একদল পরনারী অথবা পরপুরুষ যমের মত এড়িয়ে চলে, অন্য দলের পরের নর-নারী না হলে জমেই না। একদল পরের আইলে যেতেই ভয় পায়, অন্য দল পরের জমি দখল করে বিশ তলা দালান বানায়। একদল পিঁপড়া মারতেও ভয় পায়, অন্য দল মানুষ হত্যা করে মজা পায়। এক দল নিজ স্ত্রীরও অনিচ্ছার গুরুত্ব দেয়, অন্য দল পাড়া-প্রতিবেশী, চেনা-অচেনা সব মেয়ের উপরেই জবরদস্তি চড়াও হয়। এক দল ঘরের মানুষের সামনেও কম-বেশী পর্দা করে, অন্য দল কোটি মানুষের চোখের সামনে কাপড়ের বালাই ঝেড়ে ফেলে ধেই ধেই তালে লাফালাফি করে। এক দল সুদ-ঘুষের নাম শুনলেই মূর্চ্ছা যায়, অন্য দলের প্রধান উপজীব্য সুদ-ঘুষ। এটাই বেহেশতী আর দোযখীদের লক্ষণ। কে নারী আর কে পুরুষ সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজনই এখানে নেই। পুণ্যবান পুরুষ আর পুণ্যবতী রমণী, ইনশাল্লাহ্ সবাই-ই বেহেশতী। আল্লাহ্ কারুরই কর্মফল বিনষ্ট করেন না বলে বার বার আল-কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন। আজকাল কোরআন শরীফ বাংলায়ও পাওয়া যায়, সংগ্রহ করতে খরচও খুব বেশী হয় না। আল-কোরআন বা আল-হাদীস নিজে না পড়ে শুধু আজাদ সাহেবদের অপপ্রচারে কোন বুদ্ধিমতী নারী বিভ্রান্ত হবে না।

www.pathagar.com

ইসলামে কোন তন্ত্র নাই

ডঃ আজাদের আর একটা বিলাসী খেয়াল হ'ল যে, ইসলাম পুরুষতন্ত্রের ধর্ম। উপরে যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে তার আলোকে হয়ত ইতিমধ্যেই[১৭] বিষয়টা পরিষ্কার হয়েছে যে, আসলে ইসলাম কোন তন্ত্র-মন্ত্রকে পাত্তা দেয় না। যে ধর্মে বলা হয়ে থাকে যে, 'পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি' (বোখারী, মুসলিম) সে ধর্ম পুরুষতন্ত্রের ধর্ম হতে পারে না। এ হাদীস শুনে আবার হয়ত কেউ বলে বসবে যে, তাহলে এটা মাতৃতন্ত্রের ধর্ম যেহেতু বলা হয়েছে যে, মায়ের পায়ের নীচে[১৮] সন্তানের বেহেশত। আসলে তা-ও নয়। কারণ, বলা হয়েছে, 'মানুষকে সিজদা করা যদি বৈধ হত তবে প্রত্যেক নারীকে বলতাম তার নিজের স্বামীকে সিজদা করতে' (বোখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)। অর্থাৎ – ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়েরই অংশ আছে, এটা কোন তন্ত্রেরই ধর্ম নয়। এ ধর্ম শুধু সত্যটুকুই বোঝে, অন্য সব তার কাছে ফাঁকি আর মেকি, বাতিল।[১৯] এরপরেও অনেকে তর্ক করতে চায়। বলে থাকে যে, তাহলে পুরুষের কেন অত মর্যাদা। এ প্রশ্ন যারা করে তারা মা বলতে সব নারী বোঝে না, কিন্তু স্বামী বলতে সব পুরুষ বোঝে। অর্থাৎ – গন্ডগোল ধর্মে নয়, মনে আর স্বভাবে। কিন্তু ইসলাম এসব মনের গন্ডগোলের অনেক উর্ধ্বে। তার কাছে নারী-পুরুষ বড় কথা নয়, আল্লাহ্‌র আনুগত্য এবং পুণ্য কাজই সবচেয়ে বড়। তাই অতীতকালের পুণ্যবান নারী-পুরুষ

---

[১৭] 'ইতিমধ্যে' মানে এই সময়ের মধ্যে, 'ইতোমধ্যে' মানে এর বা ইহার মধ্যে। একটা সময় জ্ঞাপক, অন্যটা বস্তু বা ঘটনা জ্ঞাপক।

[১৮] এই হাদীসটি এতদঞ্চলে বিকৃত করে উদ্ধৃত করা হয়, এখানেও সেভাবেই উদ্ধৃত করা হ'ল, যা শুনতে মানুষ অভ্যস্ত। হাদীসটি আসলে অতটুকুও নয়, 'মায়ের পায়ের নীচে' কথাটাও ও-হাদীসে নাই। বলা হয়েছে,"তাহলে মায়ের কাছে থাক, 'বেহেশত মায়ের পায়ের কাছে।" তার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) জানতে চেয়েছিলেন যে, তার মা জীবিত কিনা। পিতার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেননি, সম্ভবতঃ তার পিতা যে জীবিত নাই সেটা রসূল (সঃ) আগেই জানতেন। নইলে ওই একই অধ্যায়ে যতগুলো হাদীসে মাতার উল্লেখ আছে তার সবগুলোতেই পাশাপাশি পিতারও উল্লেখ আছে। পিতা-মাতা দুইজনের খুশীর কারণে সন্তানের জন্য বেহেশেতে দুইটা দরজা খোলার বিষয়ে হাদীস আছে, আবার যে-কোন একজনের খুশীর কারণে একটি দরজা খোলার বিষয়ে উল্লেখ আছে। শুধু মায়ের একার কথা ওসব হাদীসে নাই। কাজেই পায়ের কাছে বেহেশত কথাটা একা মায়ের জন্য প্রযোজ্য, পিতার জন্য প্রযোজ্য নয় এটা বোধ হয় সঠিক নয়। সম্ভবতঃ মাতৃজাতিকে একটু বেশী খুশী করার জন্য হুজুর সাহেবরা বাকীটুকু বলেন না।

[১৯] "ওয়াকুল যা'য়াল হাক্কু ওয়া জাহাকাল বাতিলু ; ইন্নাল বাতিলা কা'না জাহুকা – আর বল, সত্য এসে গেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবেই।" সূরা বণি ইসরাইলঃ ৮১

www.pathagar.com

আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন। অভিযোগটা যেহেতু ইসলামের পুরুষপ্রীতির বিরুদ্ধে সেহেতু কতিপয় পুণ্যবতী ও শ্রদ্ধাস্পদা নারীর উদাহরণ নিম্নে উল্লেখ করা হ'লঃ

(১) হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর প্রথমা স্ত্রী নমরুদ দুহিতা পূণ্যবতী নারীর একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।[২০] নমরুদ যখন আল্লাহ্‌র নবী হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কে হত্যার উদ্দেশ্যে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করল এবং দেশের সব মানুষ এমনকি নবীজির পিতা আজর নিজেও যখন তাঁর ধ্বংস সাধনে ব্যস্ত এবং সারা দুনিয়ায় একমাত্র হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ছাড়া আর সবাই যখন মূর্তি-পূজায় লিপ্ত, ঠিক তখনই সবকিছু উপেক্ষা করে, রাজ্য, সম্মান এবং জীবনের মায়া ত্যাগ করে আল্লাহ্ আর আল্লাহ্‌র নবীর (আঃ) প্রতি ঈমান আনলেন নমরুদ দুহিতা। পৃথিবীতে এমন উদাহরণ নমরুদ দুহিতার পূর্বে আর কেউ সৃষ্টি করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। নারী যে কত ভাল হতে পারে এবং নারীর ঈমান যে কত দৃঢ় হতে পারে এ ঘটনাই তার বড় প্রমাণ। আর এ প্রমাণ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, ইসলাম পুরুষতন্ত্রের ধর্ম নয়। পুরুষতন্ত্রের ধর্ম হলে তো পুরুষরাই ঈমান আনত তার আগে, একা ওই মেয়েটি কেন ঈমান আনতে গেল আর পুরুষের অত্যাচারের শিকার হ'ল ? আল্লাহ্‌ই বা কেন তাকে অলৌকিকভাবে নমরুদের হাত থেকে রক্ষা করলেন ? সব ছাপিয়ে একটি কথাই বার বার প্রমাণ হয় – ইসলাম কোন তন্ত্র-মন্ত্রের ধার ধারে না, ঈমান ও আমলই তার কাছে বড় বিষয়। আল-কোরআনে আল্লাহ্ যেমনটি বলেছেন ঃ

"তারপর তাদের রব তাদের প্রার্থনা কবুল করে বললেন,'আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর কর্মকে বিনষ্ট করি না, তা সে হোক পুরুষ কিংবা নারী। তোমরা একে অন্যের অংশ। সুতরাং যারা হিযরত করেছে, নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে বহিস্কৃত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে, অবশ্যই আমি তাদের দোষ-ত্রুটিসমূহ মিটিয়ে দেব এবং অবশ্যই তাদের দাখিল করব বেহেশতে, প্রবাহিত হয় যার তলদেশে নহরসমূহ। এই হ'ল পুরষ্কার আল্লাহ্‌র তরফ থেকে। আর আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে উত্তম পুরষ্কার।"

(আল-কোরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াতঃ ১৯৫)

---

[২০] নমরুদ দুহিতা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অল্প। তিনি মুসলমান হয়েছিলেন এবং নমরুদের রাজ্যেও পবিত্র ছিলেন। কোন বর্ণনায় তাঁকে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর প্রথমা স্ত্রী বলা হয়েছে, কোন কোন বর্ণনায় এ তথ্য অস্বীকৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

(২) আর এক জন দৃঢ়চেতা ঈমানদার মহিলা ছিলেন বিবি সারা। তিনিও ছিলেন একজন রাজ-দুহিতা। স্বয়ম্বর সভায় শত রাজপুত্রকে উপেক্ষা করে উপস্থিত দীন-হীন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে বরণ করে নিয়েছিলেন নির্দ্বিধায়, মহান আল্লাহ্‌র নবীর পরিচয় জানার সঙ্গে সঙ্গে। অগণিত মূর্তি-পূজকের রাজ্যে নির্ভয়ে, নিঃসংঙ্কোচে গৃহহীন নবীকে প্রথম পরিচয়েই তিনি নিজের বলে গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর সারা জীবন নবীজির একান্ত ভক্ত স্ত্রী ও একনিষ্ঠ শিষ্যা হিসেবে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ্‌র নিরবচ্ছিন্ন ইবাদতে, শত বাঁধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করে, হাজার দুঃখ-কষ্টকে বরণ করে। সেই সময়ের একজন রাজদুহিতার পক্ষে এইরূপ আত্মত্যাগ বাস্তবিক বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বৃদ্ধা বয়সে পুণ্যবান স্বামীর পুণ্যবান সন্তান হযরত ইসহাক (আঃ) কে গর্ভে ধারণ করে নিজেও ধন্য হয়েছেন, বণি ইসরাঈলকেও ধন্য করেছেন। এই মহীয়সী নারীর অবাক করা জীবন-কাহিনী এবং তাঁর প্রতি মুসলমানদের প্রশ্নাতীত শ্রদ্ধাবোধ প্রমাণ করে যে, ইসলাম পুরুষতন্ত্রের ধর্ম নয়; ইসলাম কোন তন্ত্রে বিশ্বাসী নয়, ঈমান ও আমলে বিশ্বাসী।

(৩) হযরত বিবি হাজেরা, যাঁর জীবন-কথা স্মরণ করে মুসলমানরা আজও কেঁদে আকুল হয়, যাঁর ঈমানের দৃঢ়তা, আল্লাহ্‌র প্রতি সন্দেহাতীত নির্ভরতা, স্বামীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস আর ভক্তি, হাজার কষ্টেও অবিচল ধৈর্য ইত্যাদি মহতী গুণের কথা বলে শেষ করা যায় না। ছিলেন তিনি ফেরআউনের মহলের একজন সামান্যা দাসী যাঁর রূপের মোহে পড়ে ফেরআউন ধর্ষণ কামনায় তাঁকে ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে অলৌকিকভাবে বাধাগ্রস্ত হয় এবং অলৌকিকভাবে ফেরআউন বিপদগ্রস্ত হলে তাঁর কৌমার্য রক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে একই ফেরআউনের[২১] হাতে বন্দিনী বিবি সারার ক্ষেত্রেও একই অলৌকিক ঘটনা ঘটার প্রেক্ষিতে ব্যর্থ ফেরআউন সারাকে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর হাতে ফেরত দেয়ার সময় তার নিজের বিপদের কারণ হযরত হাজেরাকেও তাঁর হাত তুলে দেয়। অতঃপর সন্তানহীনা সারার উৎসাহে নবীজি (আঃ) তাঁকেও বিয়ে করেন এবং হাজেরার সন্তান হওয়ার পর[২২] বিবি সারার বারংবার অনুরোধের কারণে এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র তরফ থেকেও একই

---

[২১] হযরত মূসার (আঃ) আমলের ফেরআউন নয়, হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর সময়কার ফেরআউন। তৎকালীন বাবেল হতে সিরিয়া যাওয়ার পথে নবীজি (আঃ) তার রাজ্যের মধ্য দিয়ে গেছেন। সম্ভবতঃ সেটি মিসর নয়, তবে অতিক্রান্ত ও-রাজ্যের রাজাকেও ফেরআউন বলা হত বলে মনে হয়।

[২২] কোন কোন বর্ণনায় সন্তান হযরত ইসমাইল (আঃ) বিবি হাজেরার গর্ভে আসার পর, তাঁর জন্মের আগে।

www.pathagar.com

নির্দেশ আসার কারণে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) মাতা-পুত্রকে সুদূর জনহীন মরুভূমিতে রেখে আসেন। সিরিয়া থেকে মক্কায়। তখন অবশ্য মক্কা নগরী ছিল না, কা'বা ঘরও ওখানে ঠিক দন্ডায়মান ছিল না; কা'বার প্রথম কাঠামো আল্লাহ্ হযরত নূহ (আঃ) এর সময়কার বন্যার প্রাক্কালে তুলে নিয়েছিলেন এবং তার বাহ্যিক কাঠামো প্লাবনের সময় মাটিতে মিশে গিয়েছিল। বক্ষ্যমান ঘটনার সময় সেখানে কোন ঘর-বাড়ী, গাছ-পালা, জনপদ ইত্যাদি কিছুই ছিল না। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু বালি আর পাহাড় ছাড়া অন্য কিছুই দেখা যায় না, এমনি উষর। সিরিয়া থেকে বিবি হাজেরাকে নিয়ে উটের পিঠে রওনা হওয়ার পর সুদীর্ঘ সফর শেষে যেখানে গিয়ে তাঁর উটটি থেমে গেল আল্লাহ্র পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী নবীজি (আঃ) সেখানেই বিবি হাজেরাকে শিশু পুত্রসহ নামিয়ে দিলেন। স্থানটি বর্তমান কা'বার আঙ্গিনা-সংলগ্ন। এক ঝুড়ি খেজুর আর এক মশক পানি দিয়ে শোক-বিহ্বল নবী (আঃ) কোন কথা না বলে উট আবার ফিরতি পথে চালিয়ে দিলেন। বিধি হাজেরা ছুটে গিয়ে নবীজির কাপড় ধরে চলতে চলতে জিজ্ঞেস করছিলেন,"হে আল্লাহ্র নবী ! এই জনহীন মরুপ্রান্তরে আমাদেরকে একলা রেখে আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? আমার বড় ভয় করছে, এখানে তো কেউ নেই।" শোক-বিহ্বল নবীর মুখে তখন কথা সরে না। তিনি নীরব থাকলেন। এক সময় বিবি হাজেরা জানতে চাইলেন,"আপনি কি আমাদেরকে আল্লাহ্র আদেশে এখানে রেখে যাচ্ছেন?" এবারে নবীজি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দিলেন,"হ্যাঁ"। সহসাই বিবি হাজেরা স্বামীর কাপড় ছেড়ে দিলেন। মুখে তিনি বললেন,"আল্লাহ্র আদেশেই যদি আপনি আমাদেরকে এখানে রেখে যান, তা'হলে আমার আর কোন চিন্তা নেই। আল্লাহ্ই আমাদের দেখবেন।" তাঁর আর কোন দুঃখ-বেদনা ছিল না, প্রভু আল্লাহ্র প্রতি তাঁর এতই অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস। স্বামীর সততার প্রতিও তাঁর কি সুগভীর শ্রদ্ধা ! তাঁর দৃষ্টির বাইরে গিয়ে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) সিজদাবনত হয়ে মোনাজাত করলেন, "হে আল্লাহ্ ! আপনার ঘরের কাছে আমার স্ত্রী-পুত্রকে রেখে গেলাম, হয়ত তারা নামাজ পড়বে, আপনি তাঁদেরকে দেখুন।" দু'চারদিনের মধ্যেই বিবি হাজেরার খেজুর আর পানি ফুরিয়ে গেল। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে তিনি শিশু পুত্রকে বালুর উপর শুইয়ে রেখে নিকটস্থ সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের দিকে ছুটে গেলেন। পাহাড়ে উঠে তিনি চতুর্দিকে তাকিয়ে পানির অন্বেষণ করতে লাগলেন। দূরে তপ্ত বালুর উপর রোদের সমুজ্জ্বল ঝলকানি মরীচিকার সৃষ্টি করেছে, দেখে

www.pathagar.com

মনে হয় যেন ওই তো পানির ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। তিনি সেখানে ছুটে গেলেন; কিন্তু না ! সব মিছে। পানি নয়, শুধু বালি আর বালি। আবার তিনি অন্য পাহাড়টিতে দৌড়ে উঠলেন, আবার সেই একই পানির ঢেউ, আবার সেই হতাশা। এভাবে কমপক্ষে সাতবার তিনি সাফা ও মারওয়া পর্বতের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করলেন। একদিকে নিজের ক্ষুধা-তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, অন্যদিকে তৃষ্ণার্ত ও মুমূর্ষ সন্তানের আর্ত-চিৎকার – অসহায় মাতা সেই সঙ্কটময় অবস্থায়ও দয়াময় আল্লাহ্‌র কথা ভোলেন নি। আর্ত-চিৎকারে তিনি আল্লাহ্‌র সাহায্য ভিক্ষা করলেন। আর খুব কাছে থেকে ধ্বনি আসল,''ভয় নাই।" চমকে তিনি এদিক সেদিক তাকালেন। কিন্তু বুঝতে পারলেন না কে। তিনি বললেন,''তোমার শব্দ আমি শুনেছি। পারলে সাহায্য কর।" হয়ত বিবি হাজেরা বুঝেছিলেন, ইনি হযরত জিব্রাইল (আঃ)। কিন্তু তারপরও আতঙ্কিত হয়ে শিশুটির কাছে ছুটে গেলেন, দেখলেন মানুষের বেশে এক ফেরেশতা এসে যেখানে শিশু হযরত ইসমাইল (আঃ) চিৎকারের সময় পায়ের গোড়ালী দিয়ে আঘাত করছিলেন, ঠিক সেখানেই তাঁর হাতের লাঠি মাটির ভিতরে দাবিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অবিরল ধারায় বেরিয়ে এল স্বচ্ছ, সুন্দর ও সুপেয় মিষ্টি জলের ধারা। ইনিই ফেরেশতা হযরত জিব্রাইল (আঃ)। বিবি হাজেরাকে তিনি বললেন, ''ভয় পাবেন না। এ পানি নিজে পান করুন আর শিশুকে পান করান। এ পানি কোন সাধারণ পানি নয়। এতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দুটোই মিটবে।"[২৩] বিবি হাজেরা সাথে সাথে সে পানির ফোয়ারার চতুর্দিকে বালির বাঁধ দিয়ে দিলেন। এভাবেই সৃষ্টি হ'ল জমজম কূপের। অতঃপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বিবি হাজেরা ও শিশু হযরত ইসমাইল (আঃ) এর জমজম কূপ ঘিরে ধীরে ধীরে পত্তন হ'ল জন বসতির, গড়ে উঠল এক জনপদ যা কালক্রমে মক্কা নগরীর রূপ লাভ করল। তারপর আল্লাহ্‌র আদেশে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বাইতুল মা'মুরের[২৪] ছায়াতলে কা'বা শরীফের পূর্ববর্তী স্থানেই পুনঃ সংস্থাপন করলেন বর্তমান কা'বা ঘর। এ কাজে বালক হযরত ইসমাইল (আঃ) তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। কত পুরানা অথচ কত উজ্জ্বল সেই স্মৃতি ! মুসলমানরা আজও হযরত ইব্রাহিম (আঃ), হযরত হাজেরা (রাঃ) এবং হযরত ইসমাইল (আঃ) এর কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ

---

[২৩] বর্ণনাটি বোখারী শরীফ থেকে গৃহীত। তবে কোন কোন রেওয়ায়েতে শিশুর পায়ের তলা থেকে পানি উথলে ওঠার কথা বলা হয়েছে। হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর উপস্থিতির কথা বলা হয়নি।

[২৪] সপ্তম আসমানে ফেরেশতাদের ইবাদত গৃহ।

www.pathagar.com

করে থাকে। বিবি হাজেরার পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে আজও হাজীগণ সাফা ও মারওয়া পর্বতের মাঝে কমপক্ষে সাতবার দৌড়াদৌড়ি বা 'সাঈ' করে থাকেন। একজন নারীর পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশ্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মুসলমানদের এই 'সাঈ' করা প্রমাণ করে যে, ইসলাম কোন পুরুষতন্ত্রের ধর্ম নয়। আবার স্বামীর প্রতি বিবি হাজেরার সীমাহীন আনুগত্য, শ্রদ্ধা ও ভক্তিও প্রমাণ করে যে, ইসলাম নারীবাদ বা মাতৃতন্ত্রেরও ধর্ম নয়। আসলে ইসলামে কোন তন্ত্রের স্থান নাই।

(৪) বিবি আছিয়ার পুণ্য-স্মৃতিও হাদীসের অনেকখানি মূল্যবান স্থান জুড়ে আছে; আল-কোরআনেও তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) এর প্রচারিত ইসলাম ধর্মে শুধুমাত্র বণি ইস্রাঈলরাই দীক্ষিত হয়েছিল। মিসর রাজ্যের আদি অধিবাসী কিবতীদের মধ্য হতে একমাত্র ফেরআউনের স্ত্রী বিবি আছিয়া ছাড়া আর কেউ ঈমান আনেনি। আর এই ঈমানের কারণেই হযরত আছিয়াকে এত কঠোর অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে যে, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। দেহের বিভিন্ন অঙ্গে পেরেক ঢুকিয়ে তাঁকে আল্লাহ্ এবং তাঁর নবীর উপর আনীত ঈমান ত্যাগ করার জন্য বার বার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি ঈমান ত্যাগ করেননি। ফেরআউন শেষ পর্যন্ত তাঁকে ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ে ফেলে হত্যা করে। কিন্তু মরার পূর্ব-মুহূর্তেও তিনি আল্লাহ্র নাম উচ্চারণে বিরত হননি। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক আল-কোরআনে বলেন ঃ

" আর মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত পেশ করছেন ফেরআউনের স্ত্রীর, সে প্রার্থনা করেছিলঃ 'হে আমার প্রভু! আমার জন্য আপনার কাছে বেহেশতে একখানা গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে রক্ষা করুন ফেরআউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে এবং আমাকে নাজাত দিন জালিম কওম থেকে।"

(আল-কোরআন, সূরা-তাহ্রীম, আয়াতঃ ১১)

আল-হাদীস সাক্ষী, বিবি হযরত আছিয়া আল্লাহ্র কাছে তাঁর কাংখিত আশ্রয় লাভ করেছেন। ইসলাম ধর্ম যে পুরুষতন্ত্রের কোন ধর্ম নয়, বরং আল্লাহ্ এবং তাঁর নবীর প্রতি ঈমানই যে এই ধর্মের মুখ্য বিষয়, তা প্রমাণের জন্য হযরত আছিয়ার জীবন কাহিনীই যথেষ্ট। পুরুষের প্রাধান্যের কারণেই যদি এ ধর্মের প্রসার হয়ে থাকত তাহলে হযরত আছিয়া নিঃসন্দেহে জালিম ফেরাউনের আনুগত্যই করতেন এবং সেই আনুগত্যের কারণে মুসলমানরা তাঁকে শ্রদ্ধা করত; তা কিন্তু হয়নি। মুসলমানরা তাঁকে বরং শ্রদ্ধা করে ফেরআউনের অবাধ্য হওয়ার কারণে।

www.pathagar.com

ফেরআউনের রাজশক্তি, পুরুষ-শক্তি, স্বামী-শক্তি – সবকিছু ব্যর্থ হয়েছে হযরত আছিয়ার ঈমানের কাছে। ইসলাম কিন্তু তাঁকে সর্বযুগের চারজন শ্রেষ্ঠ মহিলার একজন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে– স্বামীর বাধ্য হওয়ার কারণে নয়, স্বামীর অবাধ্য হওয়ার কারণে। স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁকে মুমিনদের জন্য উদাহরণ করেছেন আল-কোরআনে। ইসলামের মূল কথা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান ও তাঁর রাসূলের প্রতি স্বীকৃতি। ব্যক্তিটি নারী কি পুরুষ সেটা বিবেচ্য নয়। নারীর জন্য নরের প্রতি আনুগত্য এখানে বড় কথা নয়। যে পুরুষ মুসলিম নারীর উপর স্বামীত্বের অধিকার খাটাবে তাকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। স্বামী মুসলমান না হলে তার প্রতি নারীর আনুগত্য বরং অবৈধ। অর্থাৎ– বিষয়টা ধর্ম, পুরুষ নয়। ধর্মই বলে দিচ্ছে কোন্‌টি তার পুরুষ, কোন্‌টি তার পুরুষ নয়। কিন্তু খামখেয়ালীর আশ্রয় নিয়ে ফেরআউনের মত পুরুষ ঠিক করে দিতে পারে না কোন্‌টি তার ধর্ম আর কোন্‌টি তার ধর্ম নয়। কাজেই ইসলামকে পুরুষতন্ত্রের ধর্ম বলে কোন কোন গোমরাহ্ লেখক যে যুক্তি দিচ্ছে তা ধোপে টিকছে না। ইসলাম নিয়ে নারীরও অতটা হতাশ্বাস হওয়ার মত কোন ব্যাপার ইসলামে নাই। কারণ, আল্লাহ্ নারী বা পুরুষ কারুরই কোন কৃত কর্ম নষ্ট করেন না (সূরা আল-ইমরান ঃ ১৯৫)।

(৫) বিবি রহিমার নাম শোনেনি এমন মুসলমান পৃথিবীতে আছে বলে মনে হয় না। সুদীর্ঘ আঠার বছর ধরে স্বামীর রোগে সেবা যত্ন করে এই মহীয়সী নারী পৃথিবীর বুকে এক অবিস্মরণীয় নজীর রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন আল্লাহ্র নবী হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর স্ত্রী। হযরত আইয়ুব (আঃ) রোগাক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর অন্যান্য স্ত্রীরা তাঁকে ছেড়ে চলে যায়; এক এক করে নবীর সমস্ত ধনৈশ্বর্য নষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যায়; তাঁর সাতটি শিশু সন্তানও দুর্ঘটনায় মারা যায়। কিন্তু একমাত্র বিবি রহিমা প্রাণের টানে এবং ঈমানের জোরে, আল্লাহ্র ইচ্ছায় হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর কাছে থেকে যান। দুরারোগ্য ব্যাধিহেতু নবীর গায়ের দুর্গন্ধে অস্থির এলাকাবাসী তাঁকে নিয়ে এলাকা ছাড়তে বললে বিবি রহিমা তাঁকে কাঁধে বয়ে নিয়ে কোন এক গ্রামে চলে যান। সেখানকার লোকেরা আপত্তি করলে তিনি আর এক গ্রামে চলে যান, সেখান থেকে আর এক গ্রাম, সেখান থেকে আর এক গ্রাম...এভাবে এক এক করে সাতটি গ্রাম থেকে বিতাড়িত হয়ে বিবি রহিমা তাঁর প্রিয় স্বামীকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে লোকালয় হতে এক জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নেন। একটি কুঁড়ে ঘর তুলে সেখানে তিনি স্বামীকে রাখেন এবং কখনও লোকের

www.pathagar.com

বাড়ীতে কাজ করে, কখনও ভিক্ষা করে তিনি স্বামীর ও নিজের অন্ন জোগান। পীড়িত স্বামী এত কষ্টেও আল্লাহ্‌কে ভোলেননি। উঠে বসার সাধ্য নাই, কিন্তু তিনি তাঁর নামাজ বাদ দেননি। দূরারোগ্য ব্যধির কারণে হাত দিয়ে কোন কিছু ধরতে পারতেন না বলে বিবি রহিমার চুল ধরে উঠে বসতেন এবং তাঁর সহায়তায় নামাজ আদায় করতেন। তাঁর সারা শরীরে বিচিত্র এক ধরনের পোকা হয় এবং তারা সুদীর্ঘ আঠার বছর ধরে তাঁর দেহ কুঁড়ে কুঁড়ে খেয়েছে। দুর্গন্ধে কোন মানুষ তাঁর কাছে ভিড়তে পারত না। কিন্তু বিবি রহিমা তাঁকে এক দিনের জন্যও ত্যাগ করেননি বা তাঁর মনে ব্যথা দেননি। আল্লাহ্‌ তাঁদের উভয়কেই ধৈর্য্য দিয়েছিলেন, ঈমানের প্রচন্ড শক্তি দিয়েছিলেন, যার কাছে এক সময় দুর্দশা পরাস্ত হয় এবং আল্লাহ্‌র রহমতে নবীজি (আঃ) সুস্থ হয়ে ওঠেন। হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর ধৈর্য, ঈমান এবং তাওয়াক্কুলের কথা যেমন মুসলমানরা আজও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে, তেমনি বিবি রহিমার ঈমান. স্বামী ভক্তি এবং ধৈর্য্যের কথাও তারা ব্যাকুলচিত্তে স্মরণ করে। কোন পিতৃতন্ত্র বা পুরুষতন্ত্র বিবি হযরত রহিমাকে বাধ্য করেনি স্বামীর সেবা করতে; বরং অন্যান্য স্ত্রীর মত তিনিও পারতেন তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে। তাতে বরং সেকালের সমাজ খুশীই হত। কারণ সমাজ বলতে যা বুঝায় তা সব সময়ই নবীদের বিরুদ্ধাচারণ করেছে। নবীর অন্যান্য স্ত্রী সে সুযোগই হয়ত গ্রহণ করেছিল, কিন্তু বিবি রহিমা তা করেননি। সমাজপতিদের বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে তিনি বরং তাঁর পীড়াগ্রস্ত স্বামীকে নিয়ে সমাজের বাইরে চলে গেছেন। যাদের অনুভূতি যন্ত্রের কলুষ ছোঁয়ায় আজও ভোঁতা হয়ে যায়নি তাঁরা সে ইতিহাস শুনে বা পড়ে অবশ্যই শিউরে ওঠেন, হয়ত নিজেদের অজান্তেই তাদের চোখে জলের ধারা নেমে আসে। কিন্তু মূর্খরা শুধুই হাসে, ক্ষেত্রবিশেষে তারা অবিশ্বাস করে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে আজও নহরে আইয়ুব বিদ্যমান, যা এ ঘটনার সত্যতা হয়ত পৃথিবীর অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত ঘোষণা করবে।

(৬) বিবি মরিয়ম হলেন আর একজন মুসলমান পূণ্যবতী নারীর জ্বলন্ত উদাহরণ। আল-কোরআনে যেমনটি বলা হয়েছে ঃ

"আর স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা বললঃ হে মরিয়ম। আল্লাহ্‌ তোমাকে বেছে নিয়েছেন, পবিত্র করেছেন এবং তোমাকে বিশ্বনারী সমাজের উর্ধ্বে মনোনীত করেছেন।" (আল-কোরআন, সূরা আল-ইমরানঃ আয়ত ৪২)

www.pathagar.com

হযরত মুহম্মদ (সঃ) কতৃক ঘোষিত চারজন শ্রেষ্ঠ জান্নাতী মহিলার মধ্যে তিনিও একজন। তিনি হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাতা। আল-কোর'আনে তাঁর নামে একটি স্বতন্ত্র সূরাই রয়েছে; উপরন্তু তাঁর পরিবারের নামে রয়েছে আর একটি সূরা । মুসলমানগণ অনেক পুরুষের চেয়ে তাঁকে বেশী শ্রদ্ধা করে, যেহেতু তাঁকে পুত্র সন্তানের তুলনায় অধিকতর মর্যাদাবান বলে আল-কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে (সুরা আল-ইমরান ঃ আয়াত ৩৬)। দুনিয়ার বুকেই সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তাঁর খাবার আসত। ইসলাম যে পিতৃতন্ত্রের বা পুরুষতন্ত্রের ধর্ম নয়, ইউরোপীয়দের মনগড়া তন্ত্র-মন্ত্রের ব্যাপারটি যে ইসলামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, হযরত মরিয়ম তার জ্বলন্ত উদাহরণ। ঈমান, পবিত্রতা এবং পুণ্যই ইসলামের মূল বিষয়। কে নারী আর কে পুরুষ সেটা এ ধর্মে বড় কথা নয়। বড় হ'ল ঈমান ও পুণ্য। সর্বোপরি পবিত্রতা। আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌র নবী-রসুলগণের আদেশ-নিষেধ যিনি মেনে চলেন তিনিই মুসলমান ঃ পবিত্র এবং পুণ্যবান – তা তিনি নারী-পুরুষ যেই হোন না কেন। পুণ্যবতী নারীর মর্যাদা এ ধর্মে ঈমানহারা, পুণ্যহীন পুরুষের তুলনায় অসীম। লক্ষ বা কোটি গুণের হিসাবেও এ মর্যাদা বিচার করা যাবে না। কারণ, এ হিসাবের অংকটি সত্যিই অসীম। ইসলামে পুণ্যবতী নারীর তুলনায় যে পুরুষের মর্যাদা বেশী বলে স্বীকৃত সে অবশ্যই তাঁর সমান অথবা তাঁর চেয়ে অধিক পুণ্যবান পুরুষ। মুসলমানের কাছে পুণ্যবান নারী-পুরুষের মর্যাদা সারা দুনিয়ার চেয়ে বেশী ; কিন্তু পাপী নর-নারীর মূল্য তার কাছে ছেঁড়া ন্যাকড়ার চেয়েও কম। কোন তন্ত্র-মন্ত্র এখানে কোন কাজে লাগে না।

(৭) বিবি হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর প্রশংসা হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর মুখে প্রায়ই শোনা যেত। প্রতি রাতে এশার নামাজের পর হযরত খাদিজার (রাঃ) জন্য রসুলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতেন। হযরত আয়শা (রাঃ) এব্যাপারে নবীজিকে (সঃ) একবার প্রশ্ন করায় তিনি বলেন যে, বিবি খাদিজার সাথে আর কারও তুলনা চলে না। নবীজি (সাঃ)-এর এ বক্তব্যের ব্যাপারে অবিশ্বাসীদের সন্দেহ দূর করার জন্য নিম্নের বিষয়গুলো তুলে ধরা হ'লঃ

১.নবুয়ত লাভের পূর্বে হযরত মুহম্মদ (সঃ) বিবি খাদিজার ব্যবসা দেখা-শুনা করতেন এবং উট, দুম্বা ও মেষ চরাতেন। একদিন খাদিজা কার্যোপলক্ষ্যে তাঁর বাড়ীর ছাদে উঠে দূরে মাঠের ভিতর দেখতে পেলেন যে, যুবক মোহাম্মদ (সঃ) খোলা আকাশের নীচে উটের পালের মাঝে শুয়ে আছেন এবং এক খন্ড মেঘ তাঁকে

www.pathagar.com

ছায়া করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি ইসলামের শেষ নবীকে চিনতে পারলেন। অতঃপর তিনি তাঁকে তাঁর ব্যবসায় পরিচালনার জন্য সিরিয়ায় পাঠালেন। তাঁর সততা ও দক্ষতার কারণে পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ বা তিন গুণ বেশী লাভ হ'ল। একদিন সিরিয়া থেকে ফেরার সময় দূর দিগন্ত হতে অগ্রসরমান নবীজি (সঃ) এর প্রতি বাড়ীর ছাদে বিচরণকারিনী খাদিজার দৃষ্টি পতিত হ'ল। তিনি অবাক বিস্ময়ে এক খন্ড মেঘের সেই ছায়া ধারণের দৃশ্য পুনরায় দেখলেন, যা নবীজির মাথার উপরে স্থির ছায়া হয়ে তাঁর সঙ্গে সমান গতিতে এগিয়ে এসে বিবি খাদিজার বাড়ীর আঙ্গিনায় সুস্থির হ'ল। তিনি ইসলামের শেষ নবীকে দ্বিতীয় বার চিনতে পারলেন এবং মক্কার প্রসিদ্ধ ধনী খুয়াইলিদের কন্যা হয়েও, তিনি নিজেও অত্যন্ত সুন্দরী ও ধনবতী মহিলা হয়েও, তাঁরই কর্মচারী মোহাম্মদের কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। পর পর কয়েকবার প্রস্তাব পাঠানোর পর মোহাম্মদ (সঃ) তা গ্রহণ করেন। বিবি খাদিজার এই বিশেষ দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি এবং নবুয়ত লাভের পূর্বেই মোহাম্মদ (সঃ) কে নবী হিসেবে তাঁর চিনতে পারার বিষয়টি সত্যিই অতুলনীয়। পরে অবশ্য তিনি ওরাকা বিন নওফেলের মাধ্যমে তাঁর অনুমানকে আরও সুদৃঢ় করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

২.বিবাহের পর বিবি খাদিজা (রাঃ) তাঁর সমস্ত সম্পত্তি স্বামীর হাতে তুলে দিলেন। আর হযরত মুহম্মদ (সঃ) সে সম্পদ তাঁর চোখের সামনে মক্কার দরিদ্র জন-সাধারণের মাঝে বন্টন করে দিলেন। তারা সব আনন্দ-কলরব করতে করতে মালামাল নিয়ে চলে গেল আর বিবি খাদিজা হাসিমুখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। অতঃপর এলো অভাবের পালা। এক এক করে সাত দিন পর্যন্ত অনাহারে কেটেছে তাঁর, কিন্তু কোন দিন নবীজি (সঃ) তাঁর বেজার মুখ দেখেননি। একবারও তিনি উচ্চারণ করেননি যে, তাঁর অত অত ছিল আর আজ তিনি উপবাসী। সেই ধৈর্য, স্বামীর প্রতি তাঁর অচলা ভক্তি এবং সদা হাস্যময় মুখ আজ দুনিয়ায় কোথায় পাওয়া যাবে?

৩. দুনিয়ার কোন মানুষ যখন হযরত মুহম্মদ (সঃ) কে নবী বলে স্বীকার করেনি, ঠিক তখনই বিবি খাদিজা (রাঃ) কলেমা পড়ে মুসলমান হয়েছেন। হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর হাতে তিনিই প্রথম মুসলমান।

৪.নবীজি যত রাত করেই বাড়ী ফিরতেন কোন দিন হযরত খাদিজা (রাঃ)-কে ডাক দিতে হয়নি। দরজার উপর হাত রাখলেই বৈদ্যুতিক দরজার মতই তা খুলে যেত ;

www.pathagar.com

দেখা যেত সামনে সহাস্য বদনে বিবি খাদিজা (রাঃ) দন্ডায়মান। একবার নবীজি (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে খাদিজা ! তুমি কি ঘুমাও না ?' স্মিত হাস্যে খাদিজা (রাঃ) উত্তর দিলেন, "আল্লাহ্‌র নবী রাত-বিরাতে শত শত্রুর মাঝে ইসলাম প্রচারের জন্য ঘুরে বেড়ান আর আমি তাঁর স্ত্রী ঘরের মাঝে আরামে নিদ্রা যাব, সে-ও কি হয় ?"

৫. তায়েফবাসীদের অত্যাচারে রক্তাক্ত, অর্ধমৃত নবীজি (সঃ) ঘরে ফিরে জুতা খুলতে পারলেন না। জমাট রক্তে তাঁর জুতা পায়ের সাথে আটকে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় তিনি গরম পানিতে গোসলের বাসনা ব্যক্ত করলেন। বিবি খাদিজা (রাঃ) তাঁকে জলচৌকিতে বসিয়ে গরম পানি দিয়ে গোসল করাচ্ছিলেন। গোসলের শেষ পর্যায়ে নবীজির (সঃ) চোখে পড়ল প্রবহমান জলধারার সাথে তাজা রক্ত বয়ে যাচ্ছে। তিনি সবিস্ময়ে জানতে চাইলেন যে, তাজা রক্ত কোত্থেকে এল, তাঁর শরীরের সব রক্তই তো ছিল শুকনো আর জমাট বাঁধা। বিবি খাদিজা (রাঃ) বললেন, "ও কিছু না, আপনি গোসল শেষ করুন।" কিন্তু নবীজি (সঃ) বললেন, "আগে দেখ, তাজা রক্ত কোত্থেকে এল।" বিবি খাদিজা (রাঃ) আবার বললেন "ও কিছু না, আপনি গোসল শেষ করুন।" এবারে নবীজি (সঃ) উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন। বিবি খাদিজা (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আপনি উঠবেন না।" নবীজি (সঃ) ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। তিনি তাকিয়ে দেখলেন, বিবি খাদিজার একটি পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি জলচৌকির একটি পায়ার তলায় আটকে আছে আর সেখান থেকে তাজা রক্ত জলের ধারার সাথে প্রবাহিত হচ্ছে। ব্যাপারটা আর কিছুই না, জলচৌকি পাতার সময় বিবি খাদিজার এক পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি চৌকির একটি পায়ার নীচে অসাবধানতা বশতঃ আটকে যায় এবং আঙ্গুলটি সরিয়ে নেবার পূর্বেই ক্লান্ত নবীজিও জলচৌকির উপর বসে পড়েন। অতঃপর যা হবার তা হ'ল। বিবি খাদিজা কিন্তু নবীজিকে সে কথা বুঝতেও দিলেন না, তাঁকে উঠতেও বললেন না পাছে ক্লান্ত স্বামীর কষ্ট হয়: আর সেই আটকে পড়া আঙ্গুলটি ফেটে দর দর ধারায় রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। ব্যাপারটি অনুধাবনের পর নবীজি (সঃ) বললেন, 'হে খাদিজা ! তুমি তো বলতে পারতে।" খাদিজা (রাঃ) জবাব দিলেন, "কাফিরের হাতে মার খেয়ে রক্তাক্ত ও অর্ধমৃত হয়ে আল্লাহ্‌র রসুল ঘরে ফিরলেন, তাঁকে আবার উঠতে বলে আমি কষ্ট দিব কিভাবে ?"

www.pathagar.com

৬.যে কথা আরও আগে বলা উচিৎ ছিল সে কথাটি হ'ল এই যে, হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর প্রথম প্রথম আগমনে নবীজি (সঃ) এর মনে যে ভয় ও সন্দেহ ছিল তা দূর করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন বিবি খাদিজা (রাঃ)। তিনি প্রথমবারের ঘটনার পরই তাঁর চাচা ওরাকা ইবনে নওফেলের নিকট তাঁকে নিয়ে যান এবং সেই খৃস্টান পন্ডিতকে সব ঘটনা খুলে বলেন। ওরাকার ছিল তাওরাত আর ইঞ্জিলের জ্ঞান যার বলে তিনি তাঁকে শেষ নবী বলে চিনতে পারলেন এবং অভয় দিলেন যে, আগন্তুক আর কেউ নন স্বয়ং রুহুল কুদ্দুস (হযরত জিব্রাইল)। অতঃপর তাঁকে তিনি বললেন, ''হে ভাতিজা! আপনি যখন আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রচার শুরু করবেন তখন আপনার কওম আপনাকে আপনার জন্মভূমি থেকে বের করে দিবে। তখন যদি আমি বেঁচে থাকি তবে অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করব।" আগন্তুক সত্যিই ফেরশেতা জিব্রাইল (আঃ) কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি বিবি খাদিজাকে শিখিয়ে দিলেন তাঁর পুনরাগমনের সময় যেন খাদিজা তাঁর নিজের মাথার ওড়না ফেলে দেন। শয়তান হলে সে অদৃশ্য হয়ে যাবে না; কিন্তু ফেরেশতা হলে অবশ্যই নগ্ন-মাথা নারীর সামনে থেকে সে সরে যাবে। বিবি খাদিজা নবীজীকে বললেন যাতে আবার যখন সেই ফেরেশতা আসেন তখন যেন তিনি তাঁকে অবহিত করেন। অতঃপর একদিন ঠিকই সেই ফেরেশতা এসে আসমান থেকে নবীজী (সঃ)কে দেখা দিলেন যখন বিবি খাদিজা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এ সময় বিবি খাদিজাকে তিনি ব্যাপারটা জানালেন, যেহেতু বিবি খাদিজা (রাঃ) ফেরেশতাকে দেখছিলেন না। ব্যাপার জেনে বিবি খাদিজা তাঁর স্বামীকে বললেন তাঁর বাম পাশে বসতে এবং বসার পর জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি তাঁকে তখনও দেখছেন কিনা। নবীজী (সঃ) তাঁকে দেখছেন বলে জানালে তিনি তাঁকে নিজের ডান পাশে বসিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি আগন্তুককে দেখছেন কিনা। এবারেও তিনি দেখছেন বলে জানালেন। তখন নবীজী (সঃ)কে তিনি তাঁর নিজের কোলে বসালেন এবং প্রশ্ন করলেন যে, তিনি তাঁকে দেখছেন কিনা। এবারও নবীজী (সঃ) জানালেন যে তিনি তাঁকে দেখছেন। অতঃপর বিবি খাদিজা তাঁর মাথার আবরণী ওড়নাটা ফেলে দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন যে, তখনও তিনি তাঁকে দেখছেন কিনা। জবাবে নবীজী (সঃ) জানালেন যে, তিনি আর তখন তাঁকে দেখছেন না। অর্থাৎ- রুহুল কুদ্দুস হযরত জিব্রাইল (আঃ) খালিমাথা নারী দেখে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। প্রমাণ হ'ল যে. তিনি হযরত জিব্রাইল (আঃ), তিনি

www.pathagar.com

শয়তান নন। এ ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য হ'ল নবীজীর ব্যাপারে বিবি খাদিজার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার এবং নিরবচ্ছিন্ন ভালবাসার প্রমাণ তুলে ধরা। নবীকে পাগল বা আছরগ্রস্ত না বলে স্বয়ং তাঁর পাশে থেকে নবুয়তের ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করার এ দৃষ্টান্ত শুধু বিরল নয়, বরং সব যুগে অকল্পনীয়।

হযরত খাদিজা (রাঃ) কিন্তু এ সবের একটি কাজও পুরুষ কর্তৃক বাধ্য-বাধকতার শিকার হয়ে করেননি। যা করেছেন তা তাঁর স্বভাব ধর্ম এবং অন্তরের টানেই করেছেন। আবার ইসলামের প্রবল প্রতাপশালী ও ক্ষমতাধর নবী (সঃ)ও তাঁর নয়জন স্ত্রী জীবিত থাকা অবস্থায়ও বিবি খাদিজা (রাঃ) এর জন্য চোখের জল ফেলে আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিদিন দোয়া করতে ভোলেন নি। তিনি নারী বলে নবীজি (সঃ) এর কাছে তাঁর মর্যাদা কারও চেয়ে কম ছিল না, বরং সবার চেয়ে বেশী ছিল। এটা কোন ক্রমেই প্রমাণ করে না যে, ইসলাম পুরুষতন্ত্রের ধর্ম। ইসলামে কোন তন্ত্রের কোন স্থান নেই।

৭. হযরত রাবেয়া বসরী (রঃ) এর জীবন-কাহিনীও মুসলমানরা অনেকেই জানেন। আজন্ম নিঃসঙ্গ জীবন যাপনকারিণী এই সাধ্বী তাপসী নারী সমসাময়িক সকল পীর-মাশায়েখ ও দরবেশদের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁর ওস্তাদ হযরত হাসান বসরী (রঃ)-ও তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। যমানার আমীর ওমরাহ্‌গণও তাঁকে সমীহ করতেন। এখনও সকল মুসলমান তাঁর কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে এবং তাঁর জীবনী থেকে তারা প্রেরণা লাভ করে। ইসলাম পুরুষতন্ত্রের ধর্ম হলে এটা কখনও সম্ভব হত না।

মুসলমানরা এসব পুণ্যবতী নারীকে জগতের যে-কোন ক্ষমতাধর সম্রাট বা নেতার চেয়ে অধিকতর সম্মান করে থাকেন। এতে কোনভাবেই প্রমাণ হয় না যে, এটা পুরুষতন্ত্রের ধর্ম। ইসলামে কোন তন্ত্র নাই। এ ধর্মে কোন তন্ত্র-মন্ত্রের স্থান নাই। এ দেশের কোন কোন বিভ্রান্ত বুদ্ধিজীবী অমুসলিমদের অনুকরণে ইসলামকে পিতৃ-তন্ত্রের ধর্ম বলে ঘোষণা করে স্বল্পবুদ্ধির যুবক-যুবতীর কাছে বই বিক্রির জমজমাট ব্যবসা করছেন। ডঃ আজাদও এর ব্যতিক্রম নন।

www.pathagar.com

'ফিৎনা'র বাংলা নেই

ফিৎনা সেই ব্যক্তি বা বস্তু বা ঘটনা যা কারও ঈমান, আখলাক বা আমল ধ্বংসের কারণ হয়। এ দোষ কখনও স্বয়ং ফিৎনার মধ্যে থাকে কখনও ফিৎনায় পতিত ব্যক্তির মধ্যে থাকে। 'ফিৎনা' আরবী শব্দ। শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ নেই, ইংরেজীও নেই। 'নারী' গ্রন্থে ইসলাম সম্পর্কে যত বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে বড়টা হলো 'ফিৎনা'র বাংলায় 'দুর্যোগ' শব্দটির ব্যবহার। আজাদ সাহেব আরবী জানতেন না। তিনি তাঁর ভাবগুরু টি পি হিউয়েজের ইংরেজী বই থেকে **'calamity'** শব্দটি ধার করে তার বাংলা করেছেন 'দুর্যোগ', নতুন সংস্করণে 'বিপদের জিনিস'। কিন্তু 'ফিৎনা'র অর্থ **'calamity'**ও নয়। ইসলামের অনেক পারিভাষিক শব্দের কোন প্রতিশব্দ অন্য ভাষায় হয় না। যেমন ঃ নবুয়ত, রেসালত, নবী, রাসূল, নাজিল, ফিৎনা ইত্যাদি। এগুলো আরবীর অবিকল রূপেই অন্য ভাষায় ব্যবহৃত হওয়ার নিয়ম। এ নিয়ম ভঙ্গ করলেই বিপত্তি ঘটে।

মূল হাদীসটি ছিল, ''পুরুষের জন্য নারীর চেয়ে আর অধিক ক্ষতিকর কোন ফিৎনা আমার পরে আমি রেখে যাচ্ছি না (বোখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)।" এটারই বিকৃতরূপে 'নারী' গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হয়েছে, ''পুরুষের পক্ষে নারী অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর বিপদের জিনিস আমি আমার পরে আর কিছু রাখিয়া যাইতেছি না।"('নারী', তৃতীয় সংস্করণ, পঞ্চদশ মুদ্রণ, আগামী প্রকাশন, পৃঃ ৮৩)। বলা বাহুল্য যে, লেখক ইংরেজী **calamity**-র বাংলা করেছেন দুর্যোগ বা বিপদের জিনিস। মূল শব্দটি যে 'ফিৎনা' ছিল সেটা যেমন তাঁর জানা ছিল না, তেমনি ফিৎনার প্রকৃত অর্থ কী সেটাও তাঁর আয়ত্তে ছিল না। উদ্দেশ্য সৎ কি অসৎ ছিল সেটা নির্ণয় করা না গেলেও এই বিকৃতিটুকু দিয়ে যে নারী জাতির প্রতি যারপরনাই বড় একটা উস্কানি প্রদান করা হয়েছে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মনে হয় 'নারী' গ্রন্থটিতে এটাই সবচেয়ে বড় উস্কানি এবং এই উস্কানি দিয়ে প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে যে, ইসলামের নবী নারীকে ঘৃণা করতেন। অথচ নারীর প্রকৃত সম্মান প্রদানের ব্যাপারে হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর চেয়ে বড় আর কোন মহাপুরুষ এই পৃথিবীতে কখনও জন্মাননি।

www.pathagar.com

ফিৎনা যেহেতু একটি পারিভাষিক শব্দ সেহেতু হুবহু বাংলা প্রতিশব্দ নেই। উদাহরণ দিয়ে শব্দটির ব্যাখ্যা করতে হবে। যেমন ঃ

১. দু'ভাইয়ের মধ্যে পিতৃ-সম্পত্তি বাটোয়ারার সময় একটা ভাল আম গাছ নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হলো। শালিশরা গাছটি কারও ভাগে ফেলতে পারলেন না। গাছটি রয়ে গেল এজমালী। ইচ্ছা করলে বা স্বভাব ভাল হলে দু'ভাই মিলে-মিশে গাছটির ফল ভোগ করতে পারত। কিন্তু সেটা না হয়ে যখন ওই একটা গাছকে কেন্দ্র করে উভয়ের মাঝে খুনাখুনি, রক্তারক্তি এবং মামলা-মোকদ্দমা শেষে উভয়েই পথের ভিখারীতে পরিণত হলো তখন গাছটি তাদের জন্য হয়ে গেল ফিৎনা। গাছের কোন দোষ নেই, বরং সে ভাল আম দেয়, তবু সে ফিৎনা, ওই দুই বেকুব ভাইয়ের জন্য। নারীও আজ দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় ফিৎনা বেকুব পুরুষের জন্য। নবী করিম (সঃ) এর বাণী কখনও মিথ্যা হয়নি।

২. এক ভদ্রলোক জীবনে একবার ইউপি মেম্বার হয়েছিলেন ; কিন্তু বাড়াবাড়ির কারণে জন-সমর্থন হারিয়ে পরবর্তী আর কোন নির্বাচনে তিনি বিজয়ী হতে পারেননি। তাই বলে নির্বাচন না করেও তিনি থাকেননি। প্রতিবার নির্বাচনেই তিনি বিপুল অংকের অর্থ ব্যয় করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন; কিন্তু হেরে গেছেন। এক সময় সহায়-সম্বল ভালই ছিল, আজ আর কিছু নেই। গত নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য জামানতের টাকাটাও তিনি সংগ্রহ করতে পারেননি, এমনই নিঃসম্বল আজ। নির্বাচন তাঁর জন্য ফিৎনা, যদিও নির্বাচনের কোন দোষ এখানে নেই। নারীও আজ এরকম ফিৎনা অনেক অবিবেচক পুরুষের জন্য। নবী করিম (সঃ) এর বাণী কখনও মিথ্যা হয় না।

৩. এক লোক এক সময় ভাল নামাজ-কালাম পড়তেন, সুন্নতের পায়রবী করতেন, হারাম-হালাল বেছে চলতেন। রসূল (সঃ) এর যেহেতু নির্দেশ আছে সেহেতু ওয়াজিব জ্ঞানেই তিনি সুন্দর করে দাড়ি রেখেছিলেন। বন্ধু-বান্ধবের মাঝে তিনি পরহেজগার রূপেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ এক সময় দেখা গেল তিনি মুন্ডিত-শ্মশ্রু বা ক্লিন-শেভেন হয়ে গেছেন। ব্যাপার কি খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেল যে, তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্য পাত্রী খুঁজছেন এবং পাত্রীরা দাড়িওয়ালা লোক পছন্দ করবে না আশঙ্কায় তিনি আগেই দাড়িকে বিদায় দিয়েছেন। অতঃপর এক সময় বিয়েও হয়ে গেল।

www.pathagar.com

বন্ধুদের ধারণা ছিল তিনি আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবেন। কিন্তু তা আর হয়নি। তিনি বরং তাঁর দ্বীন-ধর্মের সেবাই কমিয়ে দিলেন, স্ত্রী-সংসারের সেবায়ই অধিকতর মনোযোগী হলেন। নারী এখানে ওই পুরুষটির জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর ফিৎনা হয়ে উঠেছে, কিছুটা ওই পুরুষটির দোষে, কিছুটা নারীর নিজের দোষে। নবী করিম (সঃ) এর বাণী মিথ্যা হবার নয়, কখনও মিথ্যা হয়নি।

পুরুষের জীবনে নারীর এভাবে ফিৎনা হয়ে ওঠার হাজারো উদাহরণ দেয়া যাবে। নারীর প্রতি অত্যধিক কামনা, অতিরিক্ত আনুগত্য এবং নারীর সৌন্দর্যের প্রতি সীমাহীন দুর্বলতা আজ পুরুষের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর ফিৎনা হয়ে উঠেছে। একা নারীর দোষে এটা হয়নি। এর সিংহভাগ দোষ পুরুষের। নবী করিম (সঃ) এর বাণীর মাঝে নারীর প্রতি ঘৃণা ছিল না, পুরুষের প্রতি সতর্ক বার্তা ছিল। কিন্তু দুনিয়ার অধিকাংশ পুরুষই এ বার্তা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে তাদের দুনিয়া এবং আখেরাত দুটোই নষ্ট হয়েছে। পুরুষের জন্য এর চেয়ে বড় ফিৎনা আর কি হতে পারে !

৪. দুনিয়ায় এমন পুরুষ অগণিত যারা জাহান্নামের দরজার দিকে বিপুল উদ্যমে ছুটে চলছে নারীর দোহাই দিয়ে, নারীর উপর নিজেদের দোষের বোঝা চাপিয়ে, নিজেদের দুষ্ট মনের সকল বিনষ্ট খেয়ালের উৎস নারীকে বানিয়ে। নারী হয়ত বিষয়টা জানেই না, অনেক নারী হয়ত ঠিক ওইসব নোংরা খেয়ালের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থান করে থাকে, তথাপি পুরুষগুলো দোষ চাপায় নারীর উপর। উদাহরণ অনেক। এই যেমন দাড়ি। মুসলমান পুরুষের জন্য দাড়ি রাখা ওয়াজিব ; যার অর্থ হলো দাড়ি মুন্ডন করা হারাম। হারামকে যে হালাল জ্ঞানে নিত্য ঘটায় সে কেমন মুসলমান ? উত্তর নিষ্প্রয়োজন।

অথচ নিজেদের এই অপকর্মটির জন্য পুরুষরা যাকে উপলক্ষ করেছে সে নারী। নারী হয়ত জানেই না দাড়ি রাখা ওয়াজিব অথবা দাড়ি মুন্ডনের ব্যাপারটি তার স্বামীধন তাকে উপলক্ষ করেই ঘটাচ্ছেন। পৃথিবীতে বহু জাতির পুরুষরা দাড়ি রাখে এবং তাদের নারীরাও তাদেরকে ভালবাসে, স্বামীদের শরবতে তারা চিনিও কম দেয় না, স্বামীদের থেকে তারা বিছানাও আলাদা করে না। কিন্তু অপদার্থ মুসলমান পুরুষ তার নিজস্ব নারীর দোহাই দিয়ে দাড়ি-গোঁফ দুটাই মুন্ডন করে ঘর থেকে বের হওয়ার সাহস সঞ্চয়

www.pathagar.com

করে। রাস্তা-ঘাটে দাড়িওয়ালা পুরুষ দেখলে অবজ্ঞাভরে তাকায়, পরনারীর দিকে আগ্রহভরে ক্যাবলার মত তাকিয়ে থাকে যদি নারীটি একটু করুণা করে, যদি একটু ঠাঁই হয় তার মনের কুঠুরীতে। সারা দুনিয়ার কোন জাতির মাঝে এমন পুরুষ মূর্খ আর কোথাও পাওয়া যাবে না যারা নারীর কল্পিত খেয়ালের কারণে নিজ ধর্মের কঠোর নির্দেশকেও অমান্য করতে দ্বিধা করে না। পৃথিবীতে একজন শিখ পুরুষ পাওয়া যাবে না যার দাড়ি নেই। একজন পার্সি পুরুষ পাওয়া যাবে না যার দাড়ি নেই। প্রত্যেক জাতি তাদের নিজ নিজ 'নবী'র নির্দেশ কঠোরভাবে পালন করে থাকে, অথচ মুসলমান পুরুষ নবীর নির্দেশ অমান্য করে ব্যগ্র-ব্যাকুল খাহেশ নিয়ে এবং খাহেশের পশ্চাতে তারা উপলক্ষ করে এমন সব বস্তু বা ব্যক্তিকে যার সাথে তাদের ঘোষিত উদ্দেশ্যের দূরতম সম্পর্কও নেই। দাড়ির সাথে নারীর কোন শত্রুতা নেই, এমন অনেক নারী এ দুনিয়ায় রয়েছে যারা বরং দাড়ি-গোঁফ কামানো মেয়েলী পুরুষকে ঘৃণার চোখে দেখে, অনেকেই মুন্ডিত-শ্মশ্রু পুরুষকে পৌরুষহীন বালক জ্ঞানে এড়িয়ে যায়। পরিণত বয়সে পুরুষের দাড়ি থাকবে সেটাই বরং তাদের কাছে অনেক যুক্তিসিদ্ধ এবং পৃথিবীর অধিকাংশ জ্ঞানী-গুণী লোকের দাড়ি ছিল যারা নারীর অফুরন্ত ভালবাসা পেয়েছেন অবলীলায়। দাড়িহীন জ্ঞানী-গুণী পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল, তাই উদাহরণের প্রয়োজন নাই। পক্ষান্তরে, দুনিয়ার অধিকাংশ নিষ্ঠুর ও নারী-বিদ্বেষী ভোগী পুরুষ ছিল মুন্ডিত-শ্মশ্রু (হিটলার, মুসোলিনি, সিজার, স্ট্যালিন, হালাকু, চেঙ্গিস)। সে কারণেই দাড়ি-গোঁফহীন পুরুষকে ভালবাসে এমন নারীর সংখ্যা অবশ্যই খুব বেশী নেই। এই শ্রেণীর নারীর সংখ্যা যেমন কম, তাদের মূল্যবোধও তেমনি অনুন্নত ; দু'টাকার একটা ব্লেড যে কাউকে 'মডার্ণ' করতে পারে না এই সামান্য জ্ঞানটুকুও যাদের ঘটে নেই। তথাপি সমাজের বৃহত্তর অংশের নারীর মূল্যবোধ ও মননশীলতাকে বাদ দিয়ে উড়ুক্কু স্বভাবের কিছু লঘু মস্তিষ্কের নারীকে নিজেদের আদর্শ বানিয়ে চঞ্চলমতি পুরুষেরা দাড়ি মুন্ডনের কাজটিকে নিজেদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে নিয়েছে। অর্থাৎ- নারীকে তারা দাঁড় করিয়ে দিয়েছে স্বয়ং রাসূল (সঃ) এর ইচ্ছা ও আদেশের বিপরীতে এবং এ খাহেশের প্রতিযোগিতায় বিজয় টানছে তারা নারীর দিকে যদিও অনেক নারী ব্যাপারটা জানেও না। পুরুষের জন্য এর চেয়ে বড় ফিৎনা

www.pathagar.com

আর কি হতে পারে ? কোন মুসলমান স্বয়ং রসূল (সঃ) এর নির্দেশ স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে অমান্য করতে পারে অথবা তাঁর নির্দেশ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেও কেউ নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করতে পারে এমন বেশরম বোকা লোক কেউ দেখতে চাইলে সে যেন মুন্ডিত-শ্মশ্রু মুসলমান পুরুষের দিকে তাকায়।

৫. সমাজে ধর্মভীরু নারীর চেয়ে ধর্মদ্রোহী নারীর সংখ্যা কম। নারীর ধর্মীয় কাজ-কর্মের ভুল-ত্রুটি যেমন মার্জনীয় তেমনি পুরুষের দায়ও লক্ষণীয়। ধর্মভীরু নারীরা সমাজের ক্ষমতাবান পুরুষের পৃষ্ঠপোষকতা পায় না, কেননা ভাল নারীর কাছ থেকে দুষ্ট পুরুষ তেমন একটা লাভবান হতে পারে না, পাত্তা পায় না। তারা তাই পৃষ্ঠপোষকতা করে সেই সব নারীর যাদেরকে তারা কব্জা করতে পারে, নষ্ট করতে পারে, দায় না নিয়ে ভোগ করতে পারে। মুক্তি আর উন্নয়নের দোহাই দিয়ে তারা নারীর সাথে ধর্ম আর সংসারের একটা কৃত্রিম বিরোধ সৃষ্টি করে মওকা লুটে থাকে। অর্থাৎ-রিপুতাড়িত নীতিহীন পুরুষের জন্য নারী হয়ে উঠেছে ফিৎনা, যার আগুনে জ্বলে ধ্বংস হচ্ছে নারী-পুরুষ উভয়েই। হযরত মুহম্মদ (সঃ) মিথ্যা বলেন নি। সত্য কথা বলেছেন, হোক সে চরম, তবু সত্য। সত্যকে সত্য বলে গ্রহণ করার মত মুক্তবুদ্ধিটুকু থাকতে হবে ; 'আমি মুক্তমনা' এই আন্দেরে ভাষা আর বালসুলভ ভঙ্গিই মানুষের মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়। মুক্তমন শুধু মুক্ত যৌনতা আর নগ্নতার মাঝে সীমিত থাকলে বুঝতে হবে লোকটি আদৌ মুক্ত নয়, বরং বিকৃত রুচির পাগল বা দড়ি ছেঁড়া ষন্ড। এ ধরনের হীন প্রকৃতির অসুস্থ-আত্মার লোকের কাছ থেকে নারীজাতিকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে এবং তাদের ব্যাপারে বিশেষভাবে সাবধান থাকতে হবে। এদের থেকে সাবধানতার জন্যই আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) পর্দার ব্যবস্থা করেছেন। নর-নারীকে পরস্পরের প্রতি কামনালুব্ধ দৃষ্টিক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে এবং উপযুক্ত আবরণে আবৃত হয়ে ঘরের বাইরে যেতে বলা হয়েছে। মু'মিন পুরুষকে বলা হয়েছে দৃষ্টি নত রাখতে আর মু'মিন নারীকে বলা হয়েছে মাথার আবরণী দিয়ে কাঁধ ও বুক ঢেকে নিতে, অর্থাৎ-মাথার আবরণীটা স্থায়ী। এ আয়াতে শুধু মু'মিন নর-নারীকেই উদ্দেশ করা হয়েছে, বিদ্রোহী অবিশ্বাসীরা যে এ আয়াত মানবে না তা আল্লাহ্ পাক ভাল করেই জানেন, তাই তাদের জন্য তিনি আগুনের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

www.pathagar.com

বলা বাহুল্য যে, অতিকামদুষ্ট বিদ্রোহী বা অবিশ্বাসী না হলে কেউ পর্দার আয়াত অমান্য করে না, সে নারীই হোক আর পুরুষই হোক। সমাজ অঙ্গনে ঈভটিজিং বা ওই জাতীয় অপকর্ম সাধারণতঃ বে-পর্দা নর-নারীর মাঝেই সংঘটিত হয়ে থাকে। মু'মিন নর-নারী এ ফিৎনা থেকে সব সময়ই দূরে থাকে।

৬. নারী মাতৃজাতি। মানববিশ্বে সবচেয়ে সম্মানিত শ্রেণী হলো নারী। ইসলামে নারীর এ সম্মান স্বীকৃত। কিন্তু অতিকামুক পুরুষরা নারীকে মাতৃজাতি বলে মানে না, নারীকে স্বীকার করে তারা কামসঙ্গী হিসেবে। সে কারণেই তারা 'নারীমুক্তি' 'নারীমুক্তি' বলে চীৎকার করে গলা ফাটায়, কিন্তু নারীর সাথে তাদের কার্য-কারণ সম্পর্ক দেখলে তাদের শ্লোগানের আসল রূপটা উদ্ঘাটিত হয়ে যায়। হুমায়ুন আজাদের মত নারীবাদী লেখকের বইয়েও নারীর সম্মানজনক রূপ অনুপস্থিত। নানারূপ কামকলা আর নারীদেহের বর্ণনা রয়েছে তার বইয়ের প্রায় সবটাই জুড়ে। এ সবের সাথে নারীমুক্তির কি সম্পর্ক বা এসব করে নারী কিভাবে মুক্তি পাবে সে প্রশ্নের জবাব আজাদ সাহেবের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। নারীকে তিনি কি অবস্থায় চান সেটা অবশ্য স্পষ্ট। নারীর কোন স্বামী থাকবে না, কোন অভিভাবক থাকবে না, কোন ধর্ম চেতনা থাকবে না, কোন সতীত্বের বালাই থাকবে না, কোন লজ্জা থাকবে না, কোন পর্দা বা আবরণ থাকবে না। অর্থাৎ- যে-কোন নারীগমনে কোন বাধা-বিঘ্ন থাকবে না, ইনার মিনিং আসলে সেটাই। এ হেন পুরুষদের জীবনে নারী অবশ্যই ফিৎনা। নবী করিম (সঃ) মিথ্যা বলেন না, তাঁর কোন কথা মিথ্যাও হয় না। তাঁর ফিৎনা সংক্রান্ত হাদীসটিও মিথ্যা নয়, বরং একশতভাগ সত্য।

৭. আজ এই বিশ্বে সবচেয়ে দুর্বল ও অপমানিত জাতি মুসলমান। কিন্তু একদিন মুসলমানই ছিল সবচেয়ে সবল ও সম্মানিত সম্প্রদায়। তাদের এই অধঃপতনের মূলে যে দু'টা জিনিস সবচেয়ে বেশী কাজ করেছে সে দু'টার প্রথমটা নারী আর দ্বিতীয়টা হারাম খাদ্য। শক্তিশালী মুসলিম শাসকরা দুর্বল হয়েছিল বিজাতীয় নারীর কাছে, নটী আর নর্তকীর কাছে, রূপসী গায়িকা আর যুবতী সেবিকার কাছে ; অতঃপর আত্ম-সমর্পণ করেছিল নারীর দেয়া মদ আর মাংসের কাছে। প্রবল প্রতাপ খলিফা, সুলতান আর সম্রাটগণ

www.pathagar.com

বিজাতীয় নারীর কোলে শায়িত হয়ে বিলাস ব্যসনে সময় কাটিয়ে দেশ ও জাতির ধ্বংস ডেকে এনেছে, কোনদিন বুঝতেও পারেনি যে, নারী আর মদ ছিল তাদের বন্ধুরূপী শত্রুদেরই পাতা ফাঁদ বা ফিৎনা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এশিয়ার প্রায় সব মুসলমান বাদশাহ বা সুলতানের হেরেমে বিজাতীয় (বিশেষ করে ইহুদী, খৃস্টান আর হিন্দু) নারীর রমরমা সমাগম ছিল তাদের বিজাতীয় 'বন্ধু'দের দেয়া 'খাস' উপঢৌকন হিসেবে। অস্ত্রবলে যাদের কখনও পরাজিত করা যায়নি, এভাবেই নারীর ফিৎনায় ফেলে তাদেরকে চিরদিনের জন্য নিঃশেষ করে দেয়া হয়েছে। হালাকু খান যখন বাগদাদ আক্রমণ করেন আব্বাসীয় খলীফা তখন নর্তকী-গায়িকা পরিবৃত হয়ে নৌবিহারে নিমগ্ন; নারী, মদ আর সুরের নেশায় বেহুঁশ এবং ওই বেসামাল অবস্থায়ই হালাকুর সৈন্যরা তাকে গ্রেপ্তার করে। দজলা নদীর অসহায় পানি কয়েক মাইল জুড়ে রক্তের রঙ ধারণ করেছিল নিরীহ মুসলমানের উপর হালাকুর অস্ত্র ব্যবহারে। হাজার হাজার মুসলিম নারীও সে সময় ইজ্জত ও জীবন হারিয়েছে হালাকু-বাহিনীর হাতে। নারী যে শুধু মুসলমান পুরুষের জন্য ফিৎনা হয়েছে তা নয়, ওদের জন্যও হয়েছে সবচেয়ে বড় ফিৎনা। নারীর ইজ্জত হানির জন্য হালাকু বাহিনী ইহকালে ধিকৃত, পরকালের শাস্তি তো রয়েই গেল। নিরীহ নারীর উপর অত্যাচার আল্লাহ্ পাক কখনও সহ্য করেন না।

৮. আল-কোরআনের কোন একটি আয়াতও যদি কেউ স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে অমান্য করে বা অস্বীকার করে তবে তাৎক্ষণিকভাবেই ইসলামের সাথে তার সকল প্রকার সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়, সে হয়ে যায় 'কাফির' বা অবিশ্বাসী। আজ দেশে দেশে মুসলমানরা সূরা বাকারাহ্র আয়াত ২২৮, সূরা নূরের ৩০-৩১ নম্বর আয়াত এবং সূরা নিসার ১-৪, ১১ ও ৩৪ নম্বর আয়াতসমূহ সরাসরি লঙ্ঘন বা অমান্য করছে, অবশ্যই নারীর কারণে। সূরা বাকারাহ্ এবং সূরা মায়িদাসহ আরও বেশ কয়েকটি সূরার বেশ কিছু আয়াতও তারা প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে অস্বীকার করছে ওই একই কারণে। বলা বাহুল্য যে, এসব অমান্যকারীগণের সাথে ইসলামের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। নারী তাদের জন্য অবশ্যই ফিৎনা বা পরীক্ষা বা ধ্বংসের কারণ। নবী করিম (সঃ) অবশ্যই সত্য বলেছেন।

www.pathagar.com

৯. ইবাদত-বন্দেগীর প্রধান ও প্রথম পূর্ব-শর্ত হলো পবিত্রতা। চোখের পবিত্রতা, মনের পবিত্রতা, দেহের পবিত্রতা। পবিত্রতায় ঘাটতি পড়লে নামাজ-রোজা-কালাম সবই মাটি হয়ে যায়। উপরন্তু আওরতে সতর বা গোপনযোগ্য অঙ্গসমূহ সঠিকভাবে বস্ত্রাবৃত না হলে বা কাপড় ঠিকমত পরিধান করা না হলে কোন ইবাদত কবুল হয় না। কিন্তু অতিবুদ্ধির গুঁতায় আর মুক্তমনের ঠেলায় আজ সূরা নূরের ৩০-৩১ নম্বর আয়াত অস্বীকৃত বিধায় সমাজের কোন নর-নারীর অবস্থাই সঠিক অর্থে পবিত্র নেই। কেউই বহাল তবিয়তে নেই বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। দিল-পর্দার ভন্ডামী করে লাভ নেই, আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট আয়াত যারা মানতে পারলো না, তাদের আবার দিল-পর্দা কিসের ? তাদের দিলই তো সুস্থ নেই। এ বিষয়টি নিয়ে খুব বেশী কথা বলার ইচ্ছা নেই। মানুষের নষ্টামী দেখে বিরক্ত হওয়া ছাড়া আর কিছু লাভ হয় না। তবে ফিৎনা সংক্রান্ত হাদীসটি এ ব্যাপারে ১০০% সত্য এতে কোন ভুল নেই।

১০. আধুনিক পুরুষ নারীর মাঝে হারিয়ে গেছে, পুরুষ বলতে যা বোঝায় তা এখন ইতিহাস। দোষটা কার তা বলা মুশকিল। এক্ষেত্রে ঢালাওভাবে শুধু নারীকে দোষারোপ করা হলে ভুল হবে, শুধু পুরুষের নিন্দা করাও বোকামী হবে। মানুষের রিপুর তাড়না তাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে আধুনিক মানববিশ্ব তার দৃশ্যমান উদাহরণ। ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই, যার জন্য ব্যাখ্যা প্রয়োজন এ অংশ তার না পড়াই উচিৎ। মেকী রূপের কিরণ ছটা, আনগ্ন রঙ-রূপ-লাবণ্যের ছড়াছড়ি, বেহুদা তত্ত্বের বাড়বাড়ি মানুষকে আজ অমানুষে পরিণত করেছে। লজ্জার ছিঁটে-ফোঁটাও অবশিষ্ট নেই নারী-পুরুষ কোন পক্ষেই। নিরাপত্তা নেই কারুরই। হাঙ্গরের কাছ থেকে হাঙ্গরও নিরাপদ নয়। কারণ সবাই মুক্ত, ক্ষুধার্ত। সর্বগ্রাসী এই ক্ষুধার প্রধান কারণ নারীর নগ্নতা আর কৃত্রিম উপচারে সজ্জিত নারীর প্রতারণা। যে যা নয় সে তাই সাজে, প্রতারণা তো বটেই। এই প্রতারণার ফিৎনা এবং নগ্নতার ফিৎনায় আবদ্ধ হয়েই আগুনে উড়ে পড়া পতঙ্গ আর প্রজাপতির মত চঞ্চলমতি পুরুষ জাতি ধ্বংস হয়ে গেল। কৃত্রিম উপচারের প্রস্তুতকারক, ব্যবসায়ী, ক্রেতা-বিক্রেতা – এক কথায় এ ফিৎনার সাথে জড়িত সবাই-ই এজন্য দায়ী, সবাই এ প্রতারণা এবং তৎসংশ্লিষ্ট পরবর্তী পাপাদির জন্য দায়ী। সবচেয়ে বেশী দায়ী

www.pathagar.com

সেই পুরুষটি সংশ্লিষ্ট আসল প্রতারকটি যার নিজস্ব নারী। নারীর আসল বা কৃত্রিম রূপ-লাবণ্যের সওদাগরীতে পরের ঘরে আগুন লাগিয়ে দুনিয়ায় অনেক রসিক পুরুষ লাভবান হলেও এ ফিৎনার কারণে পরপারে তারা ঠিকই আটকা পড়ে যাবে। হাদীসের বাণী কি মিথ্যা হয় ? কখনও না।

১১. ইসলামের বিরুদ্ধে খৃস্টান জাতি ২০টিরও অধিক ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ পরিচালনা করেছে। সফল হয়নি কোনটাতেই। কিন্তু সর্বশেষ ক্রুসেড তারা পরিচালনা করেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক থেকে। এ ক্রুসেডের প্রধান হাতিয়ার নারী। নিজেদের মেয়েগুলোকে তারা পশুর মত বস্ত্রমুক্ত করে দিয়ে মুক্ত ষন্ডের মত নিজেরা তাদের দেহের 'সদ্ব্যবহার' করে বেড়াচ্ছে আর ইসলামী দুনিয়া নারীকে বন্দী করে রেখেছে বলে বই-পত্র-বক্তৃতার মাধ্যমে হায়-আফসোসের একটা মস্ত ধুঁয়া তুলে সারা দুনিয়ার নারী জাতিকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। এখন আর ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের ক্রুসেড করার দরকার নেই, যা করার নারী এবং নারীবাদীরাই করছে। ইসলামী দুনিয়া এক ধাক্কায় কুপোকাৎ হয়ে গেল। সত্য-মিথ্যা যাচাই করার শক্তি মুসলিম বিশ্ব কলোনী যুগেই হারিয়ে ফেলেছিল ; এই মিডিয়া যুগেও মুসলমানদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব না থাকায় ইসলামী হুকুম-আহকাম চরমভাবে মার খেয়ে গেল। সত্য কথা বললেও কেউ ছাপে না, ছাপলেও কেউ পড়ে না, পড়লেও কেউ বোঝে না। কোন কিছু বুঝতে হলে যে বোধশক্তি এবং শিক্ষার পুঁজি ঘটে থাকতে হয় খৃস্টান শাসকরা তা অপশিক্ষার মাধ্যমে আগেই চেঁছেপুছে নিঃশেষ করে দিয়ে গেছে। মুসলমানের 'আধুনিক' ছাওয়ালরা এখন আর 'ইসলাম' শব্দটিই সহ্য করতে পারে না। নারীর প্রতি অন্যায়-অবিচার বলতে যা বুঝায় তা মুসলমানরা করেছে না খৃস্টানরা করেছে সে কথার বিচার-বিশ্লেষণ করার মত মানুষ এখন মুসলিম বিশ্বে বলতে গেলে নাই। এখনকার প্রায় প্রতিটি মুসলিম যুবক-যুবতীর মারমুখী ধারণা একটাই, ইসলাম নারীকে ঠকিয়েছে। বলা বাহুল্য যে, খৃস্টান জাতি ইসলাম বোঝেনি, তারা ইসলামের যেসব ব্যাখ্যা দিচ্ছে তাও অযৌক্তিক ও বোকামীদুষ্ট। এসব বিষয় নিয়ে এই গ্রন্থেই পূর্বে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এখনকার মুসলিম সম্প্রদায় ইসলামের বিষয়াদির ব্যাখ্যা কোন আলেমের কাছ থেকে না নিয়ে খৃস্টান এবং খৃস্টীয় ভাবাদর্শজাত মিডিয়ার কাছ থেকে নেয় বলে ইসলামী বিধি-বিধান তার

www.pathagar.com

স্বাভাবিক আবেদন ও গ্রহণযোগ্যতা অন্ততঃ তাদের কাছে হারিয়ে ফেলেছে। এভাবেই নারী জাতিকে খৃস্টান সম্প্রদায় মুসলমানদের জন্য একটি চরম ফিৎনায় পরিণত করেছে। বলা বাহুল্য যে, এ বিষয়ে অধিকাংশ মুসলিম নর-নারীই অজ্ঞ। তারা জানেও না যে, শত্রুশিবিরের চরের দল বন্ধুর বেশে এসে তাদের কত বড় সর্বনাশটা করে গেল। যে জাতি নারীকে ভোগ্য বস্তু ছাড়া আর কিছু ভাবে না, তারাই প্রচার করে সফল হয়ে গেল যে, মুসলমানদের কাছে নারী ভোগের সামগ্রী মাত্র। আর এই প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে অধিকাংশ মুসলিম নর-নারী আল-কোরআনের অনেক আয়াত অমান্য করে বসল, হারিয়ে ফেলল ঈমান, নষ্ট করল ইহকাল-পরকাল দু'টাই। হাদীসের বাণী কি মিথ্যা হয়, হয় না। চির সত্যের উৎস কখনও মিথ্যা হতে পারে না।

১২. ঈভটিজিং, ধর্ষণ, এসিড সন্ত্রাস ইত্যাদি বহুবিধ নারীয় অপরাধে আজ গোটা পুরুষ সমাজ হাবুডুবু খাচ্ছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে এসবের ক্ষতি শুধু নারীর বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পুরুষ। নারীর রূপে মুগ্ধ হয়ে রস পিয়াসী ভ্রমরের মত দিক-দিশা হারিয়ে নিজেদের অজান্তেই পুরুষ আসলে পান করছে দুনিয়ার সবচেয়ে জঘন্য পাপের হলাহল। পরিণতি দুনিয়ায়ই হয়ে ওঠে ভয়াবহ, আখেরাতের খেসারত তো রয়েই গেল। নর-নারীর সুখের সংসারধর্ম পালনের পরিবর্তে নারীর 'সব দেখামু' মার্কা পোশাক-পরিচ্ছদ এবং পুরুষের 'খাইয়া ফালামু' ধরনের প্রেমের বন্যা দুনিয়াটাকে এক জাহান্নামে পরিণত করেছে যা কোন সুস্থ মানুষের কাম্য হতে পারে না। বলা বাহুল্য যে, নারীর বিবসনা সাজ-সজ্জার জন্য দায়ী প্রধানতঃ দরজী যার অধিকাংশই পুরুষ। কাপড় চুরি করার কারণেই হোক আর নিজেদের অতিকামের দোষেই হোক নারীর শরীর ঢাকার উপযুক্ত পোশাক তৈরী না করার জন্য যে সবচেয়ে বেশী দায়ী সে লোকটি দরজী। রেডিমেড হোক আর অর্ডারী হোক কোনটাই আর রুচিসম্মত নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়েরা ছোট-খাটো, আটসাঁট বা ফাঁক-ফোকরওয়ালা নোংরা পোশাক পরতে বাধ্য হয় নিজেদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও। অনেক সময়ই করার কিছু থাকে না, বিশেষ করে অর্থ একটা বিরাট ব্যাপার। টাকা-পয়সা খরচ করে কেউ একটা পোশাক তৈরী করতে দিলেও দেখা যায় দরজী সেটা মাপ মতো না করে ভীষণ আটসাঁট বা খাটো করে ফেলেছে অথবা বুকের কাছে বা উরুর কাছে

www.pathagar.com

প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী কেটে ফেলেছে। পছন্দ না হলেও করার কিছু থাকে না, কারণ অনেকেরই দু'বার খরচ করার মত সামর্থ যেমন নেই, তেমনি দ্বিতীয়বার বানাতে গেলেও যে একই ব্যাপার ঘটবে না তারও নিশ্চয়তা নেই। রেডিমেড কাপড়ের অবস্থা তো আরও খারাপ। খাটো হবেই, আটসাঁট হবেই, বুক-পিঠ-উরু খোলা থাকবেই। বাধ্য হয়েই মানুষ অমন পোশাক পরে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে কেননা প্রায়ই দেখা যায় সম্মানিত কারও সামনে পড়ে গেলে মেয়েরা তাদের কাপড়-চোপড় এখানে-সেখানে টানাটানি করে শরীরের বিভিন্ন অংশ ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু ঢাকে না, এক দিক ঢাকতে গিয়ে অন্য দিক বেরিয়ে পড়ে। লজ্জায় অনেক মেয়েই লাল হয়ে ওঠে। সম্মানিত লোকটিও অন্য দিকে চোখ ফেরাতে বাধ্য হন। পূরা সমাজ আজ এমনি অসহায়। বাজারের বাইরে থেকে তো আর পোশাক সংগ্রহ করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। দরজী আর ব্যবসায়ীর দল মিলে উপহার দিয়েছে এক খোলা রূপের হাট। খোলা রূপের এই হুজুগের সমাজে অনেক বেকুব পুরুষ সব কাজ-কর্ম ফেলে নারীর পেছনে লেগে থাকে জোঁকের মত, গাধার মত। নারী নিয়ে এতটা ব্যস্ত না হয়ে পুরুষের আরও অনেক কাজ করার আছে এই বাস্তব জ্ঞানটুকু যদি পুরুষের থাকত তাহলে নারীও রক্ষা পেত, পুরুষও বেঁচে-বর্তে যেত। ঈমান-আমল কারুরই নষ্ট হতো না। কিন্তু পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে নর-নারী কারুরই আর ইহকাল-পরকাল বলে কিছু থাকল না। শুধুমাত্র মাত্রাজ্ঞান এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবে নারী পুরুষের জন্য হয়ে গেল ফিৎনা, ধ্বংসের কারণ। হাদীসের বাণী ১০০% সত্য।

১৩. অমুসলিম বিশ্বে বেশ্যাবৃত্তি একটা বিরাট অর্থকরী বাণিজ্য-ব্যবস্থা। নারী সেখানে পণ্য, ভোগ্যপণ্য, কাঁচা মাংসের মত। নারীমুক্তি, নারী উন্নয়ন আর নারীর ক্ষমতায়নের কাহিনী তারা মুসলমানদের শোনায় ; কিন্তু নিজেদের নারীর রূপ-যৌবন বেচা টাকায় তাদের ফুটানী চলে বার মাস। বেশ্যাবৃত্তি অনেক রাষ্ট্রেরই আয়ের একটা বিরাট উৎস। ২০০৯ সালে যুক্তরাজ্য ১০ বিলিয়ন পাউন্ড কামাই করেছে অবৈধ ড্রাগ আর বেশ্যাবৃত্তি থেকে। এর ভেতরে ৪.৪ বিলিয়ন পাউন্ড এসেছে ড্রাগ থেকে, বাকীটা সবই নারী-বাণিজ্যের কামাই (দ্রঃ ডেইলী স্টার, পৃঃ ৮, কঃ৭-৮, তাং-৩১/৫/২০১৪)।

www.pathagar.com

অবশ্য অবৈধ ড্রাগও মূলত বেশ্যাবৃত্তির সাথে জড়িত, কোন পুরুষের কাছে ড্রাগের নিজস্ব কোন গুণ নাই, যদি না নারীমাংস ওর সাথে যুক্ত হয়। বলা বাহুল্য যে, এ আয় শুধু ওই দুই খাতের ট্যাক্স থেকে এসেছে। মূল লেনদেনের হিসাব এটা নয় এবং অবশ্যই তা এর চেয়ে কমপক্ষে শতগুণ বেশী। এ হিসাব থেকেই বোঝা যাবে যে, নারীমুক্তির মূলমন্ত্রের আবিষ্কারক ইংরেজ জাতির নারীরা কেমন আছেন ; কেমন তাদের নারীমুক্তি, কেমন তাদের নারীর ক্ষমতায়ন। নারীরা ওখানে ভাল আছেন কি খারাপ আছেন সে মীমাংসায় যাওয়ার ইচ্ছা নেই, এই তেতো অনিচ্ছার কারণ ব্যাখ্যা করারও ইচ্ছা নেই। উন্নয়ন আর ক্ষমতায়নের অমনধারা ফিৎনা থেকে আল্লাহ্ আমাদের মাতৃজাতিকে রক্ষা করুন শুধু এই প্রার্থনা করছি, আমাদের বেদনা বোধের কোন মূল্য কাউকেই দিতে হবে না। হাদীসটি সত্য আজাদ সাহেবরা শুধু এটুকু স্বীকার করলেই এ যাত্রা মুসলমানরা খালাস।

১৪. শুধু প্রশংসা এক বড় ফিৎনা। যে করে তার জন্যও ফিৎনা, যার নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা করা হয় তার জন্যও ফিৎনা। কিন্তু সবচেয়ে বড় ফিৎনা সেই আদম সন্তান যার কোন দোষের কথাই বলা যায় না, শুধু যাকে প্রশংসাই করতে হয়। নারী আজ এই রূপটাই পরিগ্রহ করেছে। তার কোন দোষের কথাই কেউ বলতেও পারে না, বললেই সে বক্তার গলা কাটতে উদ্যত হয়। নারী যাই করুক, শুধু তার প্রশংসাই করতে হবে, কোনক্রমেই অন্যথা করা যাবে না। বুদ্ধিমান লোকেরা অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে বা কথা না বলে নিরাপদ থাকার কসরৎ করে। কিন্তু সবসময় তাও সম্ভব হয় না। অনেক সময়ই গায়ে পড়ে মতামত চাওয়া হয়, চরম নিন্দনীয় কাজের জন্যও প্রশংসা আদায়ের চেষ্টা করা হয়, স্বাভাবিক শালীনতার বিরুদ্ধ কাজেও অনেক সময়ই বাধ্য করা হয়। তখনই বিপত্তি ঘটে। ফিৎনা সংক্রান্ত হাদীসটির সত্যতা আর একবার পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

১৫. নারী যে ফিৎনা তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ফাতেমা মেরিনিসসি এবং তসলীমা নাসরীন। এই দুজন নারী দুটি দেশের শান্তি নষ্ট করেছে, মুসলিম জনগোষ্ঠির অকারণ নিন্দা করেছে, ইসলামী বিধি-বিধানের বিপরীত ব্যাখ্যা করেছে এবং যা ইসলামে নাই তাই আছে এবং যা আছে তা নাই বলে প্রচার করেছে। কারণ স্পষ্ট। তারা লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছে, ইসলামের শত্রু

www.pathagar.com

শিবিরের সহযোগিতা লাভের আশা করেছে এবং সর্বোপরি উন্মুক্ত যৌনাচার চালু করার মাধ্যমে নিজেদের জীবন-যৌবন সার্থক করার কোশেশ করেছে। তারা তাদের মিশনে আংশিক সফল হয়েছে, কিন্তু ধ্বংস করেছে নিজেদেরকে, অপমানিত করেছে তাদের নিজ নিজ জাতির সকল সম্মানিত সদস্যকে। কিন্তু যৌবন শেষ হলে তারা দু'জনই তাদের পৃষ্ঠপোষকদের দ্বারা পরিত্যাক্তা হয়েছে। এদের বোধ হয় খেয়াল ছিল না যে, যৌবনও স্থায়ী নয়, জীবনও অনন্ত নয়, দুনিয়ার সব মানুষও অতটা বোকা নয়। অমুসলিম জগতে নারীমুক্তির আসল রূপটা যে কী সেটাও বোধ হয় যৌবনকালে তাদের জানা ছিল না। কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে, তাদের বদৌলতে বিভ্রান্তরা আরও বিভ্রান্ত হয়েছে, ঈমানদারদের ঈমান আরও মজবুত হয়েছে। ফিৎনা সংক্রান্ত হাদীসটি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

১৬. আধুনিক বিশ্বে পুরুষের জন্য সবচেয়ে বড় ফিৎনা হলো পর্ণোগ্রাফি যার কাঁচামাল নারী। ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। হাদীসটির সত্যতা প্রমাণিত।

১৭. মিডিয়া জগতের সবচেয়ে বড় নষ্টামী নগ্ন ছবি। এক শ্রেণীর বিকৃতরুচির ক্যামেরাম্যান সব সময় নগ্ন নারী খুঁজে বেড়ায়, পয়সা দিয়ে হলেও নগ্ন নারী ক্যামেরাবন্দী করে এবং তাদের চেয়েও কম রুচির সম্পাদক-প্রকাশকের সহায়তায় সেগুলো মিডিয়ায় প্রকাশ ক'রে পুরুষের সর্বনাশ করে। যা বন্ধুর বেশে ক্ষতি করে তা-ই ফিৎনা। এ ক্ষেত্রে বন্ধুর ওই কাজটি করে নগ্ন ছবি। ক্যামেরাম্যান, সম্পাদক, প্রকাশক, বিক্রেতা, দর্শক এবং অতঃপর ধর্ষক - কেউই এ ফিৎনার ছোবল থেকে রেহাই পাবে না, দুনিয়াতেও না, আখেরাতেও না। অতএব, হাদীসটি শতভাগ সত্য।

১৮. আধুনিক বিশ্বে সবচেয়ে অনিরাপদ সাধারণ নারীর জীবন। তারা প্রতিনিয়ত ঈভটিজিং, লাঞ্ছনা আর ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। কেউ বলে, কেউ বলে না। দুনিয়ার অধিকাংশ পুরুষ এই শেষ যুগের বর্বরতায় মর্মাহত, কিন্তু তারা তাদের নিজেদের নারীর পরিপূর্ণ নিরাপত্তা দিতেও পারছে না। কারণ আর কিছুই নয়, পাপাচারে লিপ্ত কিছু সংখ্যক উচ্ছৃংখল নর-নারীর পর্ণোগ্রাফি আর নগ্ন ছবির কারণে সমাজের বৃহত্তর নারী সমাজ যেমন পর্দার বিধান অমান্য করে অর্ধ-নগ্ন হয়ে সমাজ-জীবনকেই নগ্ন করে ফেলেছে তেমনি পুরুষ-সমাজেরও একটা বৃহদংশ অতৃপ্তকাম ও ধর্ষকাম হয়ে গেছে। যে-কোন

www.pathagar.com

উপায়ে, যে-কোন ফন্দিতে, যে-কোন মওকায় তারা পরনারী শিকারের সুযোগ খুঁজে বেড়ায়। এসব পাপমগ্ন পুরুষ চিত্রায়িত নগ্ন নারী বা রাস্তাঘাটে প্রদর্শনীর হাটের অর্ধ-নগ্ন নারীগুলোর নাগাল না পেয়ে ছলে-বলে-কৌশলে যাকে যেখানে কব্জা করতে পারে তাকে সেখানেই বেইজ্জত করে। নারীর মাতৃরূপ-স্বসারূপ সমাজে এখন আর খুব একটা দৃশ্যমান নয় বলে নারীর সাথে আচরণের সময়ও তাদের আর মা-বোনের কথা মনে থাকে না। যেদিকে চোখ যায় শুধুই নগ্নতা, শুধুই আমন্ত্রণ, শুধুই উত্তেজনা ... নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা মন-মর্জি-মেজাজ সামাল দেয়ার মতো পুরুষের সংখ্যা তাই দিন দিন কমে যাচ্ছে। পুরুষের জন্য এর চেয়ে বড় ফিৎনা আর কী হতে পারে?

১৯. পৃথিবীতে এমন একটা সময় ছিল যখন দুর্ধর্ষ ডাকাতও নারীর গায়ে হাত দিত না। শত্রু-সৈন্যরাও নারীর ওপর চড়াও হতো না। নারীর অপমান আল্লাহ্‌র গজবের কারণ তথা অপমানকারীর ধ্বংসের কারণ হবে বিবেচনায় তারা নিজ নিজ দলের সকল সদস্যকে সতর্ক করে দিত বলে শোনা যায়। ডাকাতেরও ধর্ম ছিল, শত্রুরও ধর্মজ্ঞান ছিল। অর্থাৎ- সে সময় মানুষের ধর্ম জ্ঞানই ছিল নারীর রক্ষাকবচ। কিন্তু আজ মানুষ ধর্মজ্ঞানহীন। ধর্মচর্চার প্রধান বাধা আজ নারী স্বয়ং। ধর্ম নারীকে পর্দা করতে বলে, ভুল করে নারী যার অর্থ করেছে গৃহবন্দী থাকা। বিপত্তিটা সেখানেই শুরু। অতঃপর ধর্মের সকল প্রকার শিক্ষা-দীক্ষা, চর্চা, পালন সবই প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। আজ ডাকাত তো দূরের কথা, দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের সবচেয়ে বড় শিক্ষকেরও ধর্মজ্ঞান নেই। ফলতঃ নারীও আর নিরাপদ নেই। ডাকাতের হাত থেকে তো নয়ই, সধারণ পাড়া-প্রতিবেশীর হাত থেকেও নয়। সমাজ জুড়ে যৌনজ্বরের এই ফিৎনার আগুন কে জ্বালালো ? নারী। কারা এ আগুনে পুড়ছে ? পুরুষ। কারা এতে ইন্ধন দিচ্ছে ? নারীবাদী নারী-পুরুষ। কোন পুরুষ আজকাল নারীর দিকে না তাকালে বা নারীর সাথে হ্যান্ডশেক না করলে সে পুরুষকে নারীবাদীরা গালাগাল করতেও দ্বিধা করে না। ফিৎনা সংক্রান্ত হাদীসটি ১০০% সত্য।

২০. ঈভটিজিং বা ধর্ষণের ঘটনা যেভাবেই ঘটুক ওটার শেষ কিন্তু আর হয় না। যে নারীর উপর ঘটনাটা ঘটে সন্দেহ নেই যে, সে অনেক কষ্ট-যাতনার শিকার হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমতে তার কষ্ট সাময়িক। অত্যাচারিতের কষ্ট

www.pathagar.com

এক সময় আল্লাহ্ই লাঘব করে দেন। কিন্তু ঘটনা যে পুরুষ ঘটায় তার ইহকাল-পরকাল দুটোই শেষ হয়ে যায়। তার আর মুক্তির কোন পথ থাকে না। ওই পুরুষ যত বড় বাহাদুরই হোক, আল্লাহ্র শক্তি অসীম। নারীর অপমানকারী পুরুষ দুনিয়ায় আর বেশী দিন সগৌরব টিকে থাকতে পারে না। ধ্বংস অনিবার্য। ফেরআউনের মত শক্তিশালী সম্রাটও নারীর অপমান করে টিকে থাকতে পারেনি। বিংশ শতাব্দীতেও অনেক শক্তিধর পুরুষ নারীর অপমান ঘটিয়ে বা অপমান সমর্থন করে ধ্বংসের করাল গ্রাসে পতিত হয়েছে। পরনারীর রসে মজে অনেক পুরুষ অর্থ-বিত্ত-প্রতিপত্তি সব খুইয়ে ফেলেছে এমন নজীর ভুরি ভুরি। আখেরাতের শাস্তি তো রয়েই গেল। পক্ষান্তরে, নির্যাতিতা নারীর পরকালীন শান্তির সম্ভাবনা কম যদি নির্যাতনটা তার নিজের দোষে না হয়ে থাকে এবং যদি সে ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে থাকে। মানুষ শুধু সম্ভাবনার কথাই বলতে পারে, নিশ্চয়তা আল্লাহ্র হাতে। তবে এ কথা সত্য যে, নারী-পুরুষের মাঝে জাহান্নামের এই সম্পর্কের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মূলতঃ পুরুষ। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নারীটির মুক্তির একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকলেও সংশ্লিষ্ট পুরুষটির মুক্তির সম্ভাবনা নেই বলেই মনে হয়। অবশ্য কাকে ক্ষমা করবেন আর কাকে করবেন না, তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তবে ফিৎনা সংক্রান্ত হাদীসটি সত্য ও বাস্তব, শতকরা একশ' ভাগ।

২১. আজকাল বিয়ের প্রচলন উঠে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ধনিক বিশ্বে অবিবাহিত মায়ের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। পিতৃপরিচয়হীন সন্তানের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। দরিদ্র দেশগুলোতেও এ মহা-ফিৎনার ঢেউ লেগেছে। এসব দেশেও অনেক পুরুষ এখন আর বিয়ে করতে চায় না, ভয় পায়। নারীকে ভয় পায়, নারী-প্রভাবিত অন্যায্য ব্যবস্থাকে ভয়, নির্ঘাত মৃত্যুর মত ঘর বাঁধতে ভয় পায়। এখনকার নারী স্বামী চায় না, 'স্বামী' কথাটাও তারা পছন্দ করে না, তারা চায় বন্ধু, অনুগত ও আজ্ঞাবহ পুরুষ ; তারা শ্বশুর বাড়ীর আত্মীয়-স্বজন (বিশেষ করে শ্বশুর-শাশুড়ি) চায় না, চায় নিজের পিতৃকুলের আত্মীয়-স্বজন; শান্তি চায় না, ফুর্তি আর মজমা চায় ; স্বামী চায় না, স্বামীর অর্থ চায় ; সংসার চায় না, পেশা চায়, বন্ধু-বান্ধব চায়, মজার সঙ্গী চায় ; কাজ-কর্ম, বিশেষ করে গৃহকর্ম একদম চায় না, অনুগত ও

www.pathagar.com

আজ্ঞাবহ বোকা পুরুষটির কল্যাণে ঘরটা যে-কোন উপায়ে আরামপ্রদ ও ঝকঝকে-তকতকে সাজানো-গুছানো থাকবে এবং বেহেশতের মত না চাইতেই সব প্রয়োজন মিটে যাবে সেটা চায়, না পেলেই মেজাজ বিগড়ে যায়; সন্তান চায় না, বিনোদন চায় ; স্বামীর ভালবাসা নিয়ে মাথা ঘামায় না, অধিকার চায় – নিজের মন মত অধিকার ; কোথাও সুস্থির হয়ে বসতে চায় না, প্রজাপতির মত উড়ে বেড়াতে চায় ; মুখে মুখে তর্ক করে এমন পুরুষ চায় না, ইচ্ছামত বকাঝকা করা যাবে এমন পুরুষ চায় ; নিভৃত পল্লী চায় না, শহর বা হাট-বাজার চায় ; নিভৃত গৃহকোণ চায় না, প্রদর্শনীর হাট চায়। এরকম চাওয়া-নাচাওয়ার হিসাব দিতে গেলে তালিকা আরও দীর্ঘ হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য যে, এসব মিটানো বা সব কিছু মেনে নেয়া অনেক পুরুষের পক্ষেই সম্ভব হয় না, তাই তারা বিয়ে করতে ভয় পায়। অনেক পুরুষের জন্যই নারী আজ মৃত্যুর মত ভয়াবহ। অন্য দিকে 'উপযুক্ত' পুরুষ না পাওয়ার কারণে অনেক নারীরও বিয়ে হয় না। মানব সমাজে আইবুড়ির সংখ্যা এখন অনেক বেশী। ইউরোপের অনেক দেশই আজ জন-স্বল্পতার সংকটে নিপতিত। ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে – এ হাদীসটির বাস্তব রূপ যেমন দেখা যায়, ফিৎনা সংক্রান্ত হাদীসটিও তেমনি সত্য বলে প্রমাণিত হয়।

বর্তমান পৃথিবীতে সমগ্র মানব বিশ্ব নারীর ফিৎনায় আক্রান্ত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত। এর জন্য নারীর চেয়ে পুরুষই বেশী দায়ী। পুরুষ যদি অতটা কামুক না হতো, অতটা বেকুব না হতো, তাহলে নারী-পুরুষ উভয়েই রক্ষা পেত।

www.pathagar.com

বিবিধ প্রসঙ্গ

'নারী' গ্রন্থটি অনেক বিষয়ে জনশ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চল বা আরব এলাকার বাসর রাত কিংবা আরব দেশগুলোতে নারীর খৎনা সম্পর্কিত আপত্তিকর কথা-বার্তা (দ্রঃ *কিশোরীতরুণী* অধ্যায়)। অশ্লীল ও রুচি-বিগর্হিত বিধায় উদ্ধৃতি টানব না। বাস্তবে কী আছে সেটা লেখকের দেখা উচিৎ ছিল লেখার আগে। আরবীয়রা সতী নারী চায়, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে বাসর রাতের রক্ত রুমালে মেখে পতাকা উড়ানোর মত নির্লজ্জ তারা নয়। আরবীয়রা ধর্মপ্রাণ মুসলমান। ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর গোপন কথা কাউকে বলাও হারাম, রক্তমাখা রুমাল প্রদর্শনের প্রশ্নও আসে না। ইসলামে নারীর খৎনা নেই। অথচ কোন কোন খৃস্টান ও দ্বীনত্যাগী লেখক গুজব ছড়িয়েছে যে, আরবীয় মুসলমানরা নারীর খৎনা করায় এবং নোংরা হাজামরা তাদের নোংরা হাতে কাজটা সারে বলে নারীরা রোগাক্রান্তা হয়ে থাকে। এই কাহিনী বাস্তবের সাথে যেমন মেলে না, তেমনি ইসলামের বিধানেও পড়ে না। যে সব লেখক এসব গুজব ছড়িয়েছে তারা আরবের কোন মুসলিম পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছে বলেও মনে হয় না। নিন্দা আর গুজবের মাঝে সত্য থাকে না, থাকে মূর্খতা আর অসৎ উদ্দেশ্য। এক সময় আরব বিশ্বে এসব হয়ত ছিল ; কিন্তু ইসলামের প্রচার প্রসারের পর এগুলো থাকার কথা নয়। নারীর খৎনা বা বাসর রাতের রক্ত ভেজা রুমালের ব্যাপার-স্যাপার ইসলামে নেই। যদি এখন কোথাও এসব চালু থাকে তবে তা জাহেলী যুগের সমাবর্তন ছাড়া আর কিছু নয়, ওর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নাই। এটাতে বরং হুমায়ুন আজাদের 'ইসলাম-পূর্ব' আরবের 'স্বাধীনা নারী'র কাহিনীই মার খাচ্ছে। কথিত 'ইসলাম-পূর্ব' আরবে নারীর অবস্থা কেমন ছিল সেটাই প্রকাশ পাচ্ছে।

"কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত নারী বিদ্রোহ করেন, নিজেরা গাড়ী চালিয়ে বেরিয়ে পড়েন ; সৌদী পিতৃতন্ত্র তাদের গ্রেপ্তার, চাকুরীচ্যুত করে, এবং আরও নানা হিংস্র শাস্তি দেয়, যা বাইরের জগত আজো জানতে পারেনি।" ('নারী', ৩য় সংস্করণ, ১৫শ মুদ্রণ, পৃঃ ৩৪)। এই সবজান্তার বর্ণনা শুনে অবাক হতে হয়। বাইরের জগত আজো যা জানতে পারেনি, জনাব হুমায়ুন আজাদ তা জানলেন কি করে ? তিনি কি ভিতরের জগতের

www.pathagar.com

বাসিন্দা ? 'আরো হিংস্র শাস্তিটা' কী ? আরবের কোন সুন্দরী নারীকে বন্দীনি অবস্থায় নির্জন কোন কারাকক্ষে একা পেলে তিনি নিজে যে সব হিংস্র শাস্তি দিতেন একি সেই শাস্তিগুলো ? নিজের কামনার উপর এবং জনশ্রুতির উপর এতটা নির্ভর না করাই তো লেখকের জন্য ভাল ছিল।

বলা হয়েছে, ইসলামে নারীর কাম অত্যন্ত প্রবল বলে বিশ্বাস করা হয় ('নারী', ৩য় সংস্করণ, ১৫শ মুদ্রণ, পৃঃ ৮৭)। এ কথাও সত্য নয়। স্রেফ জনশ্রুতি। বিশেষ করে বাংলাদেশে প্রচলিত কবিরাজী চিকিৎসার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গকেই এসব কথা-বার্তা বলতে শোনা যায়। বলা বাহুল্য যে, এ দেশের কবিরাজী শাস্ত্রের সাথে ইসলামের যোগসূত্র একবারেই নেই; ওটার উৎস বরং আয়ুর্বেদ বা অথর্ববেদ। ইসলামে যেটা বলা হয়েছে তার মর্মার্থ হলো স্ত্রী যাতে কামার্তা না থাকে স্বামীকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, শুধু নিজেরটা বুঝে নিলেই চলবে না, স্ত্রীর হকও আদায় করতে হবে। জনশ্রুতির চেয়ে নির্ভরযোগ্য ইসলামী পুস্তকাদির চর্চা বেশী করা লেখকের উচিৎ ছিল।

স্বচ্ছ দৃষ্টির অভাবে সঠিক জিনিসটাও তিনি বেঠিক করে দেখেছেন এবং বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা দিয়ে পাঠককে দিশেহারা করেছেন। যেমন মুসলমানদের পর্দার বিষয়টি। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, মুসলমান পিতৃতন্ত্র মনে করে যে, নারীর কাম অত্যন্ত প্রবল এবং বিধ্বংসী। যে-কোন সময় নারীর অতিকাম সমাজ-সংসারকে লন্ডভন্ড করে দিতে পারে। তাই মেয়েদেরকে তারা বোরখা দিয়ে ঢেকে রাখে। এ কথা শুনে হাসি চেপে রাখা যে-কোন মানুষের পক্ষেই কষ্টকর হয়ে পড়া স্বাভাবিক। তাঁর জানা নেই যে, অন্তরপঁচা নষ্ট পুরুষের অতিকামের জন্যই মুসলিম নারীরা পর্দা করে, নিজেদের অতিকামের জন্য নারীরা পর্দা করে না, বরং পর্দা ছিন্ন করে। মুসলমান নারীর পর্দা পুরুষের জন্য আর মুসলমান পুরুষের পর্দা নারীর জন্য। পর্দা শুধু নারী একা করে তা নয়, পুরুষরাও করে। পদ্ধতিটা অবশ্য ভিন্ন। পর্দা কখনও নিজের জন্য হয় না। পর্দা নারীর আত্মরক্ষার জন্য ; নষ্ট পুরুষদের কুদৃষ্টি আর নোংরা ছোঁয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য মুসলিম নারীরা পর্দা করে। নষ্ট পুরুষরা নারীমুক্তির শ্লোগান কেন দেয় এবং কেন তাদেরকে পর্দা ত্যাগ করতে বলে সেটা মুসলমান নারী ভাল করেই বোঝে। ঈশপের গল্পের ধূর্ত শেয়ালটি যেমন মোরগটাকে বলেছিল গাছের মগডাল থেকে নেমে এসে তার সাথে দোস্তী করতে। বাস্তব দুনিয়াই প্রমাণ করে যে, মুসলিম নারীর পর্দার বিধান তাঁদের নিজেদের স্বার্থেই নাজিল হয়েছে। কারণ, যে সব নারীর রূপ-সৌন্দর্য প্রকাশমান

www.pathagar.com

তারা প্রায়ই ঈভটিজিং বা উত্যক্তির শিকার হয় এবং তাদের নিয়ে সমাজ-সংসারে পুরুষে পুরুষে রক্তারক্তিও হয় প্রচুর। কোন পর্দানশীন নারীর জীবনে অমন দুঃখবহ ঘটনার অবতারণা খুব কমই হয়ে থাকে। তাঁরা ঘরে-বাইরে সর্বত্র মোটামুটি সম্মানের সাথেই থাকেন যা তাঁরা নিজেরাই ভাল জানেন, আজাদ সাহেবদের ওটা না জানলেও চলবে।

ডঃ আজাদ টি পি হিউয়েজের অনুকরণে ঘোষণা করেছেন যে, প্যালেস্টাইন অঞ্চলের অনেক কুসংস্কার যুক্ত হয়েছে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় ('নারী', ৩য় সংস্করণ, ১৫শ মুদ্রণ, পৃঃ ২১৭)। কিন্তু এসব কুসংস্কারের নজীর দিতে উভয়েই ব্যর্থ হয়েছেন। ইসলামে আসলে কোন কুসংস্কার নেই। কুসংস্কারের কবর দেয়াই ইসলামের চিরন্তন বিধান। টি পি হিউয়েজ খৃষ্টান। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, তার নবী খোদার পুত্র। কিন্তু খোদার তো পুত্র হওয়া সম্ভব নয়, অথচ এটাই তারা বিশ্বাস করে। এমন বিশ্বাসকেই তো বরং কুসংস্কার বলা উচিৎ। এরকম একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোক ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেবেন কিভাবে ?

হিউয়েজের অনুকরণেই বলা হয়েছে, "... মুসলমানের কোন দেবী নেই; মুসলমানের কাছে নারী সম্ভোগের সামগ্রী ; ... পৃথিবীতে এবং ইন্দ্রিয়ভারাতুর বেহেশতে।"('নারী', ৩য় সংস্করণ, ১৫শ মুদ্রণ, পৃঃ ৫৫)। এ কথার মাঝে সত্য নেই, আছে বিদ্বেষ আর অস্বচ্ছ দৃষ্টির অভিশাপ। মুসলমানের কাছে নারী নারীই। মাতা, কন্যা, ভগ্নী, দাদী, নানী, নাতনী, ভাইঝি, ভাগ্নী এবং আরও অনেক কিছু। এঁদের কারও সাথেই মুসলমান পুরুষের ভোগের সম্পর্ক নাই। শুধু স্ত্রী ব্যতিক্রম। এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে যে ব্যতিক্রম সে ব্যতিক্রম হিউয়েজ এবং আজাদ সাহেবের ক্ষেত্রেও ছিল। দুনিয়ার সব পুরুষের ক্ষেত্রেই আছে। তবে মুসলমান পুরুষের জন্য ওটুকু সুযোগও অন্যান্য সম্প্রদায়ের পুরুষের তুলনায় কম। যাদের ধর্ম নেই তাদের তুলনায় আরও কম। পাঁচ বেলা নামাজ আদায়ের জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব মুসলমানকে দিনের অধিকাংশ সময়ই পবিত্র থাকতে হয় বলে যখন তখন স্ত্রীর উপর তারা হামলে পড়তে পারে না যেটা অন্য সম্প্রদায়ের লোকজন পারে। স্ত্রীগমনের পর মুসলমানের জন্য গোসল করা ফরজ। এ অবস্থায় গোসল না করে নামাজ আদায়সহ অন্যান্য কোন ধর্মকর্ম তারা করতে পারে না। এ গোসলের ব্যবস্থা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই যা অন্য কোন সম্প্রদায়ের জন্য অতটা জরুরী নয়। ফলতঃ মুসলমান নারী-পুরুষ ইচ্ছা করলেই যখন তখন পরস্পরকে

www.pathagar.com

'আমন্ত্রণ' করতে পারে না, যেটা অন্যরা পারে। রোজা অবস্থায় মুসলমান নর-নারী আবশ্যিকভাবেই কাজটি থেকে বিরত থাকে যেহেতু ওটাই রোজার দ্বিতীয় প্রধান শর্ত। রমজান ছাড়াও অধিকাংশ মুসলমান বছরের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিনে রোজা রাখে, যা অন্যরা রাখে না। স্ত্রীর মাসিকের সময় মুসলমান পুরুষ একই বিছানায় থাকলেও আজাদ সাহেবের কথিত কাজটি তারা করে না। এভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, মুসলমান পুরুষরা অমুসলমান পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীর সংসর্গ অনেক কম পায়। অমুসলিমরা যেখানে নিজ নিজ স্ত্রী ছাড়াও অন্যান্য নারীর সাহচর্য পায় এবং ছলে-ছুঁতায় ভোগ-সম্ভোগও সেরে নিতে পারে মুসলমান সেটা পারে না। কারণ নিজ স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন অনাত্মীয় নারীর সান্নিধ্যই তারা পায় না। আত্মীয়া নারীরাও তাদের সামনে পর্দা করে। পর্দার বিধান যে সমাজে কার্যকর সে সমাজে নারীকে যে দেখতেই পেল না সে নারীকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করবে কিভাবে ? লেখকের দৃষ্টিটা আর একটু স্বচ্ছ হওয়া উচিৎ ছিল। যারা সব সময় নারী পরিবেষ্টিত থাকে, যারা পর্দা মানে না, মুক্ত যৌনতায় যারা বিশ্বাসী, যৌনকর্মী যাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধানে লাইসেন্সপ্রাপ্ত, অবিবাহিত নারী-পুরুষের একত্র বাস যাদের স্বাভাবিক রীতি, নানা রকম অনুষ্ঠানাদি ও নাচ-গানের আসরে যুবক-যুবতীর একত্র সম্মিলন যাদের সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি ভোগ-সম্ভোগের সুযোগ আর খাহেশ তো তাদেরই বেশী হওয়ার কথা। নারীকে তারাই যদি ভোগের সামগ্রী হিসেবে না দেখে তবে যাদের সমাজে পর্দার ব্যবস্থা আছে, নর-নারীর যথেচ্ছা মেলা-মেশার সুযোগ যাদের নাই তারা দেখে? যাদের বইয়ের কভারে পর্যন্ত নগ্ন নারীর ছবি থাকে, যাদের একটা পণ্যও নারীর ছবি ছাড়া চলে না, নারী বিক্রেতা না হলে যাদের দোকানও চলে না, নারীকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে তারা দেখে, না কি ওরা দেখে যারা পরনারীর দিকে চোখ তুলে পর্যন্ত তাকায় না, পরনারী দেখাও যাদের জন্য হারাম ? এ কেমন অন্যায় কথা ? মুক্ত চিন্তা করার অজুহাতে লেখক কি স্বাভাবিক বিচার জ্ঞানও হারিয়ে ফেলেছেন ? মনে হয়।

প্রাক-ইসলাম আরবের রীতি-নীতি নিয়ে গঠিত হয়েছে ইসলামী শরীয়াহ্, এমন একটি ছেলে-ভুলানো কথা তিনি জুড়ে দিয়েছেন 'পিতৃতন্ত্রের খড়গ' অধ্যায়ে ('নারী, ৩য় সংস্করণ, ১৫শ মুদ্রণ, পৃঃ৮৪)। আসলে প্রাক-ইসলাম বলে পৃথিবীতে কখনও কোন ফুা ছিল না। হযরত আদম (আঃ) এর সময় থেকেই ইসলাম ছিল, মানুষ বার বার পথভ্রষ্ট হয়েছে, ইসলামও বার বার পুনরুজ্জীবিত হয়েছে ; এর মাঝে প্রাক-ইসলাম বলে

www.pathagar.com

কখনও কিছু ছিল না। এক নবীর তিরোধানের পর অন্য নবীর আগমনের পূর্বে, অর্থাৎ-দুই নবীর মধ্যবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট জাতি বিভ্রান্তিবশতঃ তাদের জীবন-ব্যবস্থার কোন কোন রীতি-নীতি পরিবর্তন করে নিত, কিন্তু সব রীতি-নীতি তো আর পরিবর্তন হতো না। যে সব রীতির পরিবর্তন হতো নতুন নবী আসার পর সেসবই আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে যেত, আর যেসব রীতি মধ্যবর্তী বিভ্রান্তির সময়ও অপরিবর্তিত থাকত সেগুলো নতুন নবীর সময়ও অপরিবর্তিতই থেকে যেত। এটাই ইসলামী শরীয়াহ্‌র স্বরূপ। হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর সময়ও এর অন্যথা হয়নি। শরীয়াহ্ এবং মানুষের রীতি-নীতি সম্পর্কে কথা বলার আগে এসব বিষয় জেনে নেয়া উচিৎ ছিল। ইসলাম যে নতুন কোন দ্বীন নয়, এর প্রায় সবটাই যে শুরু থেকে ছিল, সেটা জানা দরকার ছিল সবার আগে।

বলা হয়েছে, ইসলামী আইনে স্ত্রী হচ্ছে চুক্তিবদ্ধ দাসী, আর স্বামী যখন ইচ্ছা মনের খেয়ালে শুধু তিনবার 'তালাক' বলে ছেড়ে দিতে পারবে ('নারী', ৩য় সংস্করণ, ১৫শ মুদ্রণ, পৃঃ ৮৫)। কিন্তু দুটো অভিযোগের একটাও সত্য নয়। ইসলামী জগতে স্ত্রী যে দাসী নয় তার সবচেয়ে সহজ প্রমাণ হলো স্ত্রীর সেবায় দাসী থাকা। স্বামীরাই এসব দাসী রাখে, স্ত্রীদের আরামের জন্য। বলা বাহুল্য যে, দাসীর জন্য কেউ দাসী রাখে না। আর একটু নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি লেখকের জন্য জরুরী ছিল। শুধু মনের খেয়ালে তিনবার তালাক বলে ছেড়ে দেয়ার এমন মনগড়া বিধানও ইসলামী শরীয়াহ্‌য় নাই। প্রতিটা মুসলমান পুরুষই জানে তালাক দেয়াটা সহজ না কঠিন। খুব কঠিন যে নয় সেটা যেমন সত্য, খুব সহজ যে নয় সেটাও তেমনি সত্য। কথাটা বলার আগে সূরা বাকারাহ্ পড়ে নেয়া উচিৎ ছিল। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফও দেখে নেয়া দরকার ছিল। স্বামীর ইচ্ছা হলেই তালাক দিতে পারে না, সুস্পষ্ট কারণ থাকতে হবে, এমন কারণ যা শরীয়াহ্-সম্মত। কোন বেশরাহ্ কারণে তালাক দেয়া যাবে না। এক সাথে তিন তালাক দেয়া যায় না, ওটাও হারাম। গর্ভবতী নারীকেও তালাক দেয়া যায় না, ওটাও হারাম। যেখানে তালাক দেয়া হালাল বা বৈধ সেখানেও তালাক দেয়া কঠিন, কেননা সাথে জড়িয়ে আছে সামাজিক, আর্থিক ও শরীয়াহ্ সম্মত অন্যান্য বিষয়। আল্লাহ্ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তালাকের ব্যাপারে বার বার সতর্ক করেছেন। "বৈধ হলেও আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় বিষয় হলো তালাক।" এবং "তালাকে আল্লাহ্‌র আরশ কেঁপে ওঠে।" সিহাহ্ সিত্তার এই দুটি হাদীস বোধ হয় সব মুসলমানই জানে এবং

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র অপছন্দ আর আরশের কেঁপে ওঠার অর্থ কী বা কতটা ভয়ের কারণ তাও মুসলমানরা জানে। তালাক একটা মন্দের ভাল ব্যবস্থা, পিঠ দেয়ালে ঠেকে না গেলে কোন জ্ঞানবান মুসলমান তালাক দেয় না। অস্থানে এবং অকারণে তালাক দিলে তার জন্য পরকালে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। শরীয়াহ্‌র জ্ঞান যার নাই তার জন্য স্ত্রীকে তালাক দেয়া যত সহজ, শরীয়াহ্‌ যে জানে তার জন্য তালাক দেয়া ততই কঠিন। বাংলাদেশে তালাক একটি সমস্যা সন্দেহ নেই ; কিন্তু তার জন্য হুমায়ুন আজাদের মত বুদ্ধিজীবীরাই প্রধানতঃ দায়ী। ওনারাই তো ইসলামী শিক্ষা থেকে মানুষকে বঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা করে এ সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। ব্যাপারটা চাক্ষুষ। এদেশে ইসলামী জ্ঞানসম্পন্ন কোন মানুষ সাধারণতঃ স্ত্রীকে তালাক দেয় না, তাদের স্ত্রীরাও তালাক চায় না, তাদের দাম্পত্য জীবনে অশান্তির নজীর লাখেও একটা পাওয়া যাবে না। কিন্তু সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকজন খুব কম সময়ই দাম্পত্য-সুখ ভোগ করতে পারে। আর অশিক্ষিত লোকের তো কথাই নাই, তাদের কবুল বলতেও সময় লাগে না, তালাক দিতেও সময় লাগে না। এ জন্য ইসলামী শরীয়াহ্‌র দোষটা কোথায় ?

''ইসলামে বিবাহবিচ্ছেদ বা তালাক গেলাশ থেকে জল ঢালার থেকেও সহজ - স্বামীর জন্য ; আর স্ত্রীর জন্য ফাঁসির রজ্জু খোলার মতই কঠিন।''('নারী', ৩য় সংস্করণ, ১৫শ মুদ্রণ, পৃঃ ৮৮)। সত্য নয়। ওই একই কথা প্রযোজ্য। এটা বাংলাদেশে, যেখানে স্ত্রীর তালাক চাইতে গেলে কোর্টে যেতে হয়, স্বামীকেও তালাক দিতে হলে নারী নির্যাতন মামলা বা যৌতুক আইনে মামলার মোকাবেলা করতে হয়। জেল-জরিমানা এখানে স্বাভাবিক একটা বিষয়, ইসলামী শরীয়াহ্‌র সাথে যার আসলে কোন সম্পর্কই নাই। ইসলামী শরীয়াহ্‌ মতে স্ত্রী তালাক দিতে পারে না, তালাক দিতে পারে স্বামী। কারণ যিনি (স্বামী) বলেন বিবাহ করলাম, তিনিই বলতে পারেন বিবাহ ভাঙলাম বা তালাক দিলাম। যিনি (স্ত্রী) বলেন কবুল করলাম, তিনিই বলতে পারেন সম্মতি ফেরত নিলাম, অর্থাৎ- তালাক চাই। স্ত্রী তালাক চাইলে এবং কোন বুঝ-ব্যবস্থায় না আসতে চাইলে তালাক দেয়াটা স্বামীর জন্য হয়ে পড়ে আবশ্যিক। এটা ফাঁসির রজ্জু খোলার মত কঠিনও নয়, গেলাশ থেকে জল ঢালার মত সহজও নয়। ইসলামী বিবাহে স্ত্রীর সম্মতি আবশ্যিক। অসম্মত নারীকে বিবাহ করা জায়েজ নয়। এ কারণেই স্ত্রী তালাক চাইলে তালাক দেয়া স্বামীর জন্য জরুরী হয়ে পড়ে। নবী করিম (সঃ) এর সময় এমনি এক রমণী তার স্বামীর কাছে তালাক চাইলেন। স্বামী রাসূল (সঃ) এর কাছে এসে কান্নাকাটি

www.pathagar.com

করলেন। রাসূল (সঃ) ওই মহিলাকে তাঁর স্বামীর কান্নাকাটির কথা বলে তার সিদ্ধান্ত পাল্টানোর অনুরোধ করলেন। কিন্তু মহিলা তার সিদ্ধান্তে অনড় থাকলেন। অতঃপর তালাক হয়ে গেল (দ্রঃ মুসলিম শরীফ)। হযরত মুহম্মদ (সঃ) নিজেও একবার তাঁর স্ত্রীদের বলেছিলেন ইচ্ছা হলে তালাক চাইতে আর চাইলেই তিনি তালাক দিয়ে দিবেন (তবে তালাক কেউ চাননি)। ইসলামী শরীয়াহ্য় স্বামীর তালাক দেয়ার চেয়ে স্ত্রীর তালাক পাওয়াই বরং সহজ। এটাই ইসলামী শরীয়াহ্। আজাদ সাহেবের ভাষ্য ইসলামী শরীয়াহ্র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। স্ত্রী তালাক চাওয়ার পরেও তাকে তালাক না দেয়া কোন মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়, অমুসলিম হলে বা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যেতে চাইলে সেটা ভিন্ন কথা। ইসলামের এই সহজ বিধানের জ্ঞান থেকে এদেশের মানুষকে যারা বঞ্চিত রেখেছে আজাদ সাহেবও তাদের একজন। শিক্ষা কারিক্যুলাম থেকে এসব জরুরী বিষয় দূরে রাখার জন্য অন্যান্যদের মত তাঁরও ভূমিকা আছে। মুসলমান দম্পতির চেয়ে সুখী দম্পতি পৃথিবীর আর কোন ব্যবস্থায় হওয়া সম্ভব নয়, যদি উভয়ের ইসলামী জ্ঞান থাকে। মুসলমান স্ত্রীর চেয়ে সহজ পদ্ধতিতে আর কোন সম্প্রদায়ের স্ত্রীর তালাক পাওয়াও সম্ভব নয় যদি উভয়ের ইসলামী জ্ঞান থাকে। আজাদ সাহেব তালাক সম্পর্কে 'নারী' গ্রন্থে যা লিখেছেন তা নিতান্তই অনিসলামিক।

ইসলামী বিয়েতে বর-কনের যে সম্মতির শর্ত রয়েছে আজাদ সাহেব তার মাঝে 'সম্মতির অভিনয়' দেখেছেন ('নারী', ৩য় সংস্করণ, ১৫শ মুদ্রণ, পৃঃ ৮৬)। এ অভিযোগও সত্য নয়। ইসলামী শরীয়াহ্য় সম্মতির শর্তই রাখা হয়েছে, অভিনয়ের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। কেউ যদি কোন কারণে অভিনয় করে বা অভিনয় করতে কেউ কাউকে বাধ্য করে, সেটা ওই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ত্রুটি। রীতিমত অপরাধ। ওর দায় ইসলামের ওপর চাপানো অন্যায়। ইসলামের জরুরী বিষয়াদির উপর শিক্ষা পেলে কেউ এ ধরনের অপরাধ করতো না। ইসলামী জ্ঞান থেকে যারা নিজেরা বঞ্চিত রয়েছেন এবং যারা অন্যকেও বঞ্চিত করেছেন এ দায় তাদের, অর্থাৎ– যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাস প্রণয়ন করেন এ দায় প্রধানতঃ তাদের। এ দায় হতে হুমায়ুন আজাদও মুক্ত নন, তিনিও একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদ ছিলেন।

''বাইবেল ও কোরানে ও সব ধর্মপুস্তকে ঋতুকে দেখা হয়েছে ভয়ের চোখে, ঋতুমতী নারীদের নির্দেশ করা হয়েছে নিষিদ্ধ ও দূষিত প্রাণীরূপে।" ('নারী', ৩য় সংস্করণ, ১৫শ মুদ্রণ, পৃঃ ৪৪)। বাইবেল বা অন্য কোন ধর্মপুস্তকের ব্যাপারে আমার জানা থাকলেও

www.pathagar.com

বলার অধিকার নেই, তাই শুধু আল-কোরআনের ব্যাপারে বলছি যে, কথাটা সত্য নয়। ঋতুকে আল-কোরআনে কোথাও ভয়ের চোখে দেখা হয়নি, ঋতুমতী নারীকেও কোথাও 'নিষিদ্ধ ও দূষিত প্রাণীরূপে নির্দেশ করা' হয়নি। আল-কোরআনে ঋতুস্রাবকে অপবিত্র বলা হয়েছে, ঠিক যেমনটি প্রস্রাব, পায়খানা, বীর্য ইত্যাদিকে অপবিত্র বলা হয়েছে মানব-যৌনাঙ্গের সব বর্জ্যই অপবিত্র, এটাই ইসলামের বিধান, এখানে নারী-পুরুষের ব্যাপারে কোন আলাদা বিধান নেই, কোন ব্যবধান নেই। ঋতুস্রাবকে হুমায়ুন আজাদ নিজেও বর্জ্য বলেছেন ('নারী', ৩য় সংস্করণ, ১৫শ মুদ্রণ, পৃঃ ২২২), এতে গন্ধ আছে এবং এটা মরা রক্ত সেটাও বলেছেন। অথচ এ রক্ত অপবিত্র, ধর্মগ্রন্থের এ কথা মানতে তিনি রাজী নন। ধর্মের বিরোধিতা তার জন্য এতই জরুরী, আশ্চর্য ! এই ঋতুস্রাব নিয়ে তিনি এমন কিছু কথা বলেছেন যা আলোচনা করতে রুচিতে বাঁধে। তাই সে আলোচনায় যাব না। তবে সাধারণের উদ্দেশ্যে বলা দরকার যে, এ সময় মুসলমান নারী অস্পৃশ্য হয় না, নবী করিম (সঃ) তাঁর ঋতুমতী স্ত্রীদের চুম্বন করতেন, তাঁদের ধুয়ে দেয়া কাপড় পরে নামাজ আদায় করতেন, একই বিছানায় ঘুমাতেন। শুধু যে কাজটিতে গোসল ফরজ হয় সে কাজটিই বাদ দেয়ার বিধান। এর কারণ অনেক; প্রধান কারণ উভয়ের পবিত্রতা ও স্বাস্থ্যগত দিক। মরা রক্তযুক্ত ঠান্ডা বর্জ্য মন্থন করতে গেলে পুরুষ প্রত্যঙ্গটির ক্ষতি অনিবার্য। তাছাড়া নারীর জন্য এ সময় 'ওটা' বেদনাদায়ক, এমনিতেও ঋতুস্রাব বেদনাদায়ক, এটা সবাই জানে। কাজেই বিরত থাকাই উত্তম। আল-কোরআন কোন ভুল ব্যবস্থা নির্দেশ করেনি, বিজ্ঞানের চেয়েও তার ব্যবস্থা বেশী শুদ্ধ। বিজ্ঞানের ভুল হতে পারে, আল-কোরআনের ভুল হয় না। অবশ্য বিজ্ঞানও এ সময় ওই কাজটা করতে বলেনি।

'তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র' আল-কোরআনের এ বাণীর বিরোধিতা করা হয়েছে প্রচুর, কিন্তু যুৎসই কোন বিরুদ্ধ যুক্তি উপস্থাপন করা লেখকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কথাটা পুরুষের স্ত্রীগমনের ক্ষেত্রেই শুধু প্রযোজ্য, অন্য কোন ক্ষেত্রে নয়। পুরুষের বীর্য জীবনের বীজ-স্বরূপ, সে বীজ যেখানে পতিত হয় বা যে পাত্র সে বীজ ধারণ করে সে ক্ষেত্র-স্বরূপ, ওখান থেকে যা উৎপন্ন হয় তা শস্য-স্বরূপ। অর্থাৎ- সন্তান। কথাটা নিতান্তই রূপক। বর্ণনার শ্লীলতা রক্ষার জন্যই বাক্যটি রূপকাশ্রয়ী হয়েছে বলে মনে হয়। কিভাবে সন্তান হয়, ওখানে কার কি ভূমিকা, তা সব স্বামী-স্ত্রীরই জানা। স্ত্রীকে গর্ভবতী, সন্তানবতী বা আসন্ন প্রসবা ইত্যাদি বলা যতটা শালীন

www.pathagar.com

তার চেয়ে বেশী শালীন হলো তাকে ফলবতী বলা। এতে কেমন একটা মিষ্টি ও মায়াবী আবহের সৃষ্টি হয়, যা অন্য কোন শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। এই অর্থেই স্ত্রীরা স্বামীদের ক্ষেত্রস্বরূপ। অশালীন কথা আল-কোরআনে নাই, যা বলা হয়েছে তা শালীনতা রক্ষার স্বার্থেই বলা হয়েছে। এতে মাতৃজাতির বরং খুশী হওয়ার কথা। স্বামীদের উপরও এতে অনেক দায়িত্ব চাপে। আর যাই হোক এর মাঝে নারীর জন্য অপমানকর কিছু আছে বলে মনে করার কোন কারণ নাই। এটা নিয়ে বেহুদা অপব্যাখ্যা করেই বরং আজাদ সাহেব নারীর অপমান করেছেন।

'নারী' গন্থের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল বিয়ে-বহির্ভূত যৌনতার সপক্ষে প্রচারণা এবং বিয়ে ব্যবস্থা বাদ দেয়ার পক্ষে কৌশলগত সুপারিশ। বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে বিয়ের অপকারিতা দেখানোর ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে। লেখকের কথা-বার্তায় মনে হয় যেন তিনি দুনিয়ার সব নারীর মনের খবর এবং দেহের ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা বিলকুল জানেন এবং নারীরা যে বিবাহিত জীবনে কেউ তৃপ্ত নয়, কারুরই যে ... মেটে না এ ব্যাপারে তিনি একেবারে নিঃসন্দেহ। এরকম হঠকারী প্রপাগান্ডা চালানোর মত অনুমতি তিনি কোথায় পেলেন, সে প্রশ্ন পাঠক করতেই পারেন। সবচেয়ে বড় কথা হল নারী জাতি মনে হয় এতটা কামাকুল নয়। অকারণে তাদের সম্পর্কে এরকম বেহুদা প্রচারণা একদিকে যেমন তাঁর নিজের অসুস্থ কামনার পরিচয় বহন করে, অন্য দিকে তেমনি নারী জাতি সম্পর্কেও পাঠকের নীচ প্রকৃতির মনোভাব জন্ম দিতে পারে যা কোন ক্রমেই কাম্য হতে পারে না। মাতৃ-জাতিকে কেউ এভাবে অপমান করার অধিকার রাখে না।

বিয়ে-বর্হিভূত যৌনতার অনেক খারাপ দিক রয়েছে। যেমন ঃ

১. এইডসের মত মারণব্যাধির বিস্তার।
২. সন্তানের পিতৃ-পরিচয় লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা, যেহেতু নির্ধারিত পুরুষ আর থাকছে না।
৩. বংশ ধারার বিলুপ্তি, যেহেতু নির্ধারিত পিতা থাকছে না।
৪. সন্তান লালন-পালনে পিতার দায়-দায়িত্ব না থাকার কারণে অধিকাংশ সন্তানের অসহায় অবস্থায় পতিত হওয়ার সম্ভাবনা। কার সন্তান কে লালন করবে ?

www.pathagar.com

৫. সন্তান লালন-পালনের সমস্ত দায়ভার পড়বে একা মাতার উপর। বিবাহ থাকলে যেখানে মা নিজেও স্বামীর তত্ত্বাবধানের সুবিধা লাভ করত, অন্ন-বস্ত্রের নিশ্চয়তা পেত, সেখানে স্বামীহীন অবস্থায় সে নিজেরটা তো পাবেই না, সন্তানেরটাও তাকেই দেখতে হবে। যদি যার সন্তান তাকে খুঁজে বের করে অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে তো সেও আর এক ধরনের বিবাহ-ব্যবস্থাই হল। মাঝখান থেকে খোঁজাখুঁজির ঝামেলাটা হবে একেবারেই বেহুদা।

৬. ভ্রমর সদৃশ অতি পিয়াসী পুরুষগুলো শত শত নারীর গর্ভাধানের ব্যবস্থা করে আরও নতুন নারীর সন্ধানে সটকে পড়বে। দুষ্ট পুরুষেরা গড়ে তুলবে শত শত হারেম ও বেশ্যালয়।

৭. একটা সুন্দরীও যাতে হাতছাড়া না হয় সে জন্য দুষ্ট পুরুষগুলো সব কাজ-কর্ম ফেলে নারীর পশ্চাতেই ছুটতে থাকবে। দুনিয়া জঙ্গল হয়ে যাবে যদি পুরুষ কাজ ছেড়ে দেয়।

৮. সমাজে কামুক পুরুষগুলো হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে পড়বে। এখনও হানাহানি আছে, তবে তা একেবারে উন্মুক্ত নয়। উন্মুক্ত যৌনতায় হানাহানিও হবে উন্মুক্ত। শৃংখলা রক্ষা করা রাষ্ট্রের জন্য কঠিন হয়ে পড়বে।

৯. সুন্দরী মেয়ে একটাও বাঁচবে না। কারণ, সব পুরুষ তাদের নিয়ে টানা-হেঁচড়া করবে। এক সময় তারা মারা পড়বে, হয় টানাটানিতে নয় তো মারামারিতে। তা ছাড়া শতজনের অতিভোগ তো থাকবেই, সেটাও তাদের মৃত্যুর কারণ হবে।

১০. পরিবার ব্যবস্থা উধাও হয়ে যাওয়ার কারণে সমাজ বলে আর কিছু থাকবে না। পরিবার না থাকলে, সমাজ না থাকলে, রাষ্ট্রই বা টিকবে কি করে ?

ডঃ আজাদের একটা প্রেসক্রিপশন কাজে লাগাতে গেলে মানব সভ্যতার বিলুপ্তি এভাবেই ঘটে যাবে এবং তাতে সময় লাগবে দশ থেকে পনের বছর।

এই দেশের বুদ্ধিজীবীদের একটা বিরাট অংশই পাঠকের কাছে কাংখিত সততা বজায় রাখেন না। পাঠকদের অনেকেই যেহেতু তাঁদের চেয়ে কম জানেন সেহেতু তারা তাঁদেরকে কিছু তথ্য দান করেন আর কিছু তথ্য স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে গোপন করেন। যেমন 'নারী' গ্রন্থে বলা হয়েছে সৌদী আরবে ব্যভিচারিণীদের পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হয়।

www.pathagar.com

কিন্তু ব্যভিচারীদের শাস্তির কথা লেখক বিলকুল খেয়ে ফেলেছেন। ওটা বলেননি, কারণ তাতে নারীর মন শরীয়াহ্‌র উপর বিরূপ হবে না। ইসলামী বিচার-ব্যবস্থায় ব্যভিচারিণী নারী কিছুটা বাড়তি সুবিধা পায় যা ব্যভিচারী পুরুষ পায় না। যেমন ঃ গর্ভবতী নারীর উপর হদ বা ছঙ্গেছার প্রয়োগ করা যায় না, দুগ্ধপোষ্য সন্তানের মায়ের উপরও শাস্তি আরোপ করা যায় না, দাসীর ব্যভিচারের শাস্তি অর্ধেক, নারীর বিরুদ্ধে অভিযোগকারী যদি চারজন সাক্ষী হাজির করতে ব্যর্থ হয় তবে অভিযোগকারী শাস্তি পায় ইত্যাদি। কিন্তু এসবের একটা কথাও আজাদ সাহেব উল্লেখ করেননি, বরং তাঁর অভিযোগ দেখে মনে হয় ইসলামী বিচার-ব্যবস্থায় শাস্তি বুঝি শুধু নারীই পায়, পুরুষ বুঝি কোন শাস্তিই পায় না। তাঁর কাজটাই নারীকে বিভ্রান্ত করা, সত্য বলে যা সম্ভব নয়। দোযখের বাসিন্দাদের ব্যাপারে প্রচলিত হাদীসটির অর্ধেক তিনি উদ্ধৃত করেছেন, বাকী অর্ধেক বিলকুল গায়েব করে দিয়েছেন। ফলতঃ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, দোযখ বুঝি শুধুই নারীর জন্য, আর পুরুষরা বুঝি সবাই বেহেশতের বাসিন্দা। হাদীসে তো বাস্তবে সে রকম ছিল না। ছিল, 'আমি দোযখের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দা ধনী লোক আর মেয়ে লোক (বোখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)।' হাদীসে যদি কোন কারণে ও-রকম কথা থেকেও থাকে তবে তার আগে-পরের হাদীস থেকে অর্থটা পরিষ্কার হতো। কিন্তু হুমায়ুন আজাদ তাঁর উদ্ধৃতিতে মেয়েলোক বা নারী কথাটা রেখেছেন, কিন্তু ধনী লোক কথাটা স্রেফ উধাও করে দিয়েছেন। পাঠকের সাথে এমন আচরণ কতটা শ্রদ্ধার যোগ্য তা পাঠক নিজেই বিচার করবেন। দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, এ দেশের প্রায় সব শিক্ষিতা নারীই আজাদ সাহেবের বইটি পড়েছেন, কিন্তু সিহাহ্ সিত্তাহ্ বা নির্ভরযোগ্য কোন হাদীস গ্রন্থ তারা কেউ ছুঁয়ে দেখেননি, ব্যতিক্রম যদি থাকে তবে তা দু'চারজনের বেশী হবে না। এরকম প্রতিকূল অবস্থায় মিথ্যার এই বেসাতী থেকে এ জাতির মুক্তির উপায় কী ? 'একজন পূণ্যবতী নারীর মর্যাদা ৭০ জন পুরুষ অলীর চেয়ে বেশী।'-এরকম হাদীসও তো ছিল। কিন্তু সে হাদীস পরিবেশন করা হয়নি, কারণ নারী জাতিকে বিভ্রান্ত করার খাহেশ তাতে পূরা হবে না। নারী নিজেও হাদীস গ্রন্থ ছোঁবে না, যে সব বই বা পত্র-পত্রিকায় ইসলামের সঠিক রূপ তুলে ধরা হয় নারী সেগুলো হাতে নিয়েও দেখবে না। বরং সেগুলোর বিরুদ্ধে অসাধু বুদ্ধিজীবীরা তাদের ক্ষেপিয়ে তুলে আন্দোলনে নামাবে। এ জাতির মুক্তি কোথায় ? আবারও বলছি, এ জাতির মুক্তি কোথায় ?

www.pathagar.com

বলা হয়েছে মুসলিম পুরুষ বিয়ে করতে পারে মুশরিক নারী বা অগ্নি উপাসক নারীকেও ('নারী', ৩য় সংস্করণ, ১৫শ মুদ্রণ, পৃঃ ৮৭)। হুমায়ুন আজাদের এ কথাটিও ডাহা মিথ্যা। সম্ভবতঃ মুশরিক নারী বা অগ্নি পূজারিণী হারাম হওয়ার বিষয়টি তাঁর জানাই ছিল না। সূরা বাকারাহ্‌র ২২১ এবং সূরা নূরের ৩ নং আয়াত দু'টি বোধ হয় তাঁর চোখে কখনও পড়েনি। খুব সম্ভব মোগল সম্রাট আকবরের বিয়ে ব্যবস্থাকেই তিনি মুসলিম বিয়ে ব্যবস্থা বলে মনে করেছেন। বড় লেখকের অজ্ঞতা বড়ই হয়। বড় লজ্জার বিষয়।

বলা হয়েছে, "মুসলমান পুরুষ চারটি বৈধ বিয়ে করতে পারে, পঞ্চম একটিও করতে পারে। পঞ্চম বিয়ে করলে বিয়েটি বাতিল হয় না, শুধু তার দরকার পড়ে আগের একটি স্ত্রীকে এক-দুই-তিন করে তালাক দেয়া।" ('নারী', ৩য় সংস্করণ, ১৫শ মুদ্রণ, পৃঃ ৮৭)। এ বড় আজব ফতোয়া, কোন সূত্রও উল্লেখ করা হয়নি। তবে পঞ্চম বিয়ে হারাম। হারামকে যে হালাল জানে সে মুসলমান নয়। যেটি শুরুতেই হারাম সেটিকে পরে হালাল করার সুযোগ নেই। 'ইদ্দা' পদ্ধতিতে আরব অঞ্চলে একজন পুরুষের আটজন স্ত্রী রাখার আজগুবী বিধানও 'নারী' গ্রন্থে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এই পদ্ধতিতে চারজন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে নতুন চারজন নারীকে বিয়ে করে আরবীয়রা স্ত্রী বানায়। পরে ইদ্দা পালনের সময়ের মধ্যে পূর্বের তালাক দেয়া স্ত্রীদের ফেরত আনে এবং পরে বিয়ে করা চারজনকে তালাক দেয় এবং পর্যায়ক্রমে ইদ্দা পালনের সময়ের মধ্যে তাদেরকে ফেরত এনে পূর্বের চারজনকে আবার তালাক দেয়। এ পদ্ধতিতে একজন লোকের কর্মরত চারজন আর ছুটি ভোগরত চারজন, মোট আট জন স্ত্রী থাকে বলে মন্তব্য করা হয়েছে ('নারী', ৩য় সংস্করণ, ১৫শ মুদ্রণ, পৃঃ ৮৮)। বলা বাহুল্য যে, এটার ভিত্তিও গুজব। কোন একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফতোয়া বিভাগ থেকে একটি অনারারী ডক্টরেট ডিগ্রি দিলে বোধ হয় ডঃ আজাদের যথাযথ সম্মান করা হতো। 'নারী' গ্রন্থে প্রদত্ত ফতোয়াগুলো তাতে একটু হালে পানি পেত। কিন্তু এ ফতোয়া আপাতত হালে পানি পাচ্ছে না। কারণ ঃ

১. ইসলামী শরীয়াহ্‌ এমন খামখেয়ালী অনুমোদন করে না।
২. আরবীয়রা ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তারা হারাম-হালালের পার্থক্য করে। বর্ণিত পদ্ধতিটা স্পষ্টতঃ হারাম। যদি কেউ এ পদ্ধতি সত্যিই অবলম্বন করে থাকে

www.pathagar.com

তবে সেটা নিতান্তই ব্যতিক্রম। এজন্য ঢালাওভাবে একটা জাতির নিন্দা করা অন্যায়।

৩. প্রতিজন পুরুষের চারজন বা আটজন স্ত্রী থাকতে হলে যত নারী আরবে থাকা দরকার তত নারী আরবে নাই।

৪. আরবের নারীরা এত বোকা নয় যে, এমন খোলামকুচির স্বামীকে তারা বার বার গ্রহণ করবে। ইসলামী বিয়েতে নারীর মত থাকা অত্যাবশ্যক।

৫. জনাব আজাদ একবারও আরব যাননি। তাই আরব সমাজের ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে আলোকিত নয়, যদিও তাঁর সমগোত্রীয় লোকজন তাঁকে 'আলোকিত মানুষ' বলে গণ্য করে থাকেন।

৬. পশ্চিমা বিশ্বের সাথে মিশে যাওয়া মানুষগুলো আরব বিশ্বের স্বাভাবিক সমাজ ব্যবস্থা বা সাধারণ মানুষের 'স্ট্যান্ডার্ড' নয়।

ব্যতিক্রমী চরিত্রের কারও মাঝে যদি পশ্চিমা বিশ্বের নোংরামী দেখাও যায় তবে তাই দিয়ে আরব বিশ্বের সমাজ ব্যবস্থাকে যেমন মাপা যাবে না তেমনি ওই পরিমাপ দিয়ে ইসলামকেও মাপা যাবে না। ইসলাম কোন জাতির বা কোন দেশের নিজস্ব সম্পদ নয়। বিভ্রান্ত কোন লেখকের লেখা পড়ে সেটাকে সত্য বলে ধরে নেয়ার আগে বাস্তবের সাথে মিলিয়ে নেয়া আজাদ সাহেবের মত বিদগ্ধ জনের জন্য অবশ্যই জরুরী ছিল। কারণ পাঠক তাঁর কাছ থেকে গুজব নয়, বরং মান সম্মত লেখা আশা করে।

নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে হুমায়ুন আজাদ অন্যান্য নারীবাদীদের মতই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটার উপরই জোর দিয়েছেন সবচেয়ে বেশী। নর-নারীর প্রতিনিধি হিসেবে তিনি প্রত্যেক ঘরে স্বামী আর স্ত্রীকে ধরেছেন প্রতীকী একক হিসেবে। কিন্তু দুনিয়ার অনেক নর-নারীর ঘরেই যে স্বামী বা স্ত্রী নেই, সে খবর মনে হয় তাঁর জানা ছিল না। অবশ্য দুনিয়ার কোন নারীবাদীই স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের গোপন সম্পর্কটার বাইরে আর তেমন কিছু ভাবতে পারে বলে মনেও হয় না। তাঁদের কাছে বোধ হয় নারী মানেই যুবতী নারী। যে-কোন নারীবাদীর যে-কোন বই নিয়ে কথা হোক না কেন, দেখা যাবে যে, বইটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় স্বামী-স্ত্রীর গোপন বিষয়াদি, বিশেষ করে নারীর গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে উত্তেজক কথা-বার্তা। অথচ এরাই প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে, ধর্মের অনুসারীরা নারীকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে দেখে, যদিও ধর্মের অনুসারীদের মুখে বা লেখায় নারীর যৌবন বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা খুব একটা

www.pathagar.com

ঠাঁই পায় না। তাঁরা বরং এসব বিষয় নিয়ে কথা বলতেও লজ্জা পান। অন্য দিকে নারীবাদীদের মুখে এবং লেখায় গোপন বিষয়াদি এবং গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা একটা অবশ্যম্ভাবী ও আবশ্যিক ব্যাপার। তাদের কথা-বার্তায় মনে হয় এসব অশ্লীল বর্ণনা কোন ব্যাপারই নয়, নিতান্তই ডাল-ভাত। পক্ষান্তরে, তাদের হাবভাব আর কর্মকান্ড দেখে মনে হয় যেন নারী-পুরুষের ওই একটি কাজ ছাড়া মানবজাতির আর কিছু করারই নেই। আমাদের নারীসমাজ এদের হাত থেকে কতটা নিরাপদ সময় থাকতে সেটাই ভাবার বিষয়।

মুক্তির উপায়

এ যুগের গন্ড-মূর্খরাও বলে থাকে, "জ্ঞানের কোন বিকল্প নাই।" অনেকে আবার নলেজ বেজ্‌ড সোসাইটি বা জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজের কথাও বলে থাকে। কিন্তু জ্ঞান বলতে তারা টেকনিক্যাল তথ্য-উপাত্ত এবং বিজ্ঞানের নামে কিছু তত্ত্বীয় বিষয় বুঝে থাকে। সন্দেহ নেই যে, এসব জরুরী বিষয়। কিন্তু দ্বীন বা ধর্মের জ্ঞান তার চেয়েও জরুরী। মানুষের বেঁচে থাকার বাস্তব প্রয়োজনে, সুস্থ চেতনার মানুষ সৃষ্টির গরজে, সমাজ জীবনকে সুন্দর ও অপরাধমুক্ত করার তাগিদেই ধর্মীয় শিক্ষা প্রয়োজন। বিজ্ঞান যদি ধর্ম-চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকত তাহলে কোন্ বোমার অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকতো না। বিচার যদি দ্বীনের হুকুমে চলত তাহলে মানব সমাজ কলুষমুক্ত থাকত। রাজনীতি যদি ধর্মজ্ঞানে সমৃদ্ধ হতো তবে দুনিয়ার বুকে এত হানাহানি থাকত না, ভন্ডামী দূর হতো, দুর্নীতির কবর হতো। ধর্মের নামে যেসব অধার্মিক দলবাজি চলছে সেটাও বন্ধ হতো। নারীমুক্তির প্রলোভনে ফেলে নারী জাতির অপমান করাও কোন কামুক পুরুষের পক্ষে সম্ভব হতো না। ধর্মজ্ঞানের অভাব না হলে ধর্মের বিরোধিতাই বুদ্ধিবৃত্তি বলে বিবেচিত হতো না। এ সমাজে সব অনাচারের মূলেই ধর্মীয় শিক্ষার অভাব। জ্ঞান আহরণ করা ইসলামে ফরজ হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান জ্ঞান বিমুখ। অর্থাৎ-ফরজ থেকে তারা পলায়মান। আর সেই পাপের ফলই আজ সারা দুনিয়া ভোগ করছে।

www.pathagar.com

মাদ্রাসা শিক্ষা এই অজ্ঞান দূর করার জন্য যেমন যথেষ্ট নয়, তেমনি সে নিজেও স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। সাধারণ শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা– এই উভয় প্রকার শিক্ষারই তাই সংস্কার প্রয়োজন। উভয় শিক্ষারই সিলেবাস বা কারিক্যুলাম পুনর্গঠন করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে সর্বশেষ পর্যায় পর্যন্ত সকল বিষয়ের সাথে দ্বীনের চর্চা বাধ্যতামূলক করা হলেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যথার্থ শিক্ষিত মানুষ বেরিয়ে এলে মেকী পন্ডিত, হাবাগোবা আলেম আর অজ্ঞ বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব ঘটবে না। 'নারী' গ্রন্থের মত অজ্ঞতা, নগ্নতা আর অশ্লীলতার জ্বলন্ত অঙ্গার সমাজের বুকে আর আগুন জ্বালাবে না।

মানবজাতির প্রকৃত শান্তি ও উন্নতি রয়েছে প্রকৃত শিক্ষায়। দ্বীন-ধর্মকে বাদ দিয়ে সে শিক্ষা হয় না, যেমন দুনিয়াকে বাদ দিয়েও মানুষের চলে না। উভয় প্রকার শিক্ষা না হলে স্বয়ং-সম্পূর্ণ মানুষ পাওয়া যায় না। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ জাতির জন্য দুর্ভোগ ; কারণ তার সততা নেই, হাতের কাছে যা পায় তা-ই সে খেয়ে ফেলে অথবা অযথা অপচয়ের মাধ্যমে জাতীয় সম্পদ নষ্ট করে ফেলে। সঠিক মূল্যবোধ গড়ে না ওঠার কারণে নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কও তার কাছে হয়ে দাঁড়ায় নিতান্তই একটা ভোগ-সম্ভোগের মাত্রাহীন ব্যাপার। উদাহরণ প্রয়োজন নেই, চোখ থাকলেই দেখা যায়। কতগুলো তত্ত্ব বা তথ্য দিয়ে তো আর প্রকৃত শিক্ষালাভ হয় না। বানরের উত্তর পুরুষ তৈরী করা আর মানুষ করা এক কথা নয়। অপর দিকে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি জাতির জন্য বোঝা ; কারণ সে বাস্তব দুনিয়ার কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলায় অতিনম্র, অক্ষম ও দুর্বল। এ উভয় প্রকার শিক্ষারই সংস্কার প্রয়োজন। সাধারণ শিক্ষার সাথে যুক্ত করতে হবে দ্বীন-ধর্ম, মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে যুক্ত করতে হবে দুনিয়া। অবশ্যই সে সংস্কারেরও মাত্রা থাকতে হবে। কোন কিছুই যেন অতিমাত্রিক না হয়। মৌলিক আদল যেন কোনটারই বিনষ্ট না হয়। কোন পক্ষের উপরেই যেন অতিরিক্ত পাঠক্রমের বোঝা না চাপে। অতঃপর উভয় শিক্ষা যেদিন প্রকৃত মানুষ গড়ার মত সম্পূর্ণ হবে সেদিন এ জাতির বহুদিনের কাঙ্খিত মুক্তি, ঈর্ষণীয় উন্নতি আর অজেয় সম্মান স্বয়ং বাস্তবের রূপ ধরে সামনে এসে দাঁড়াবে, জাতিকে সসম্ভ্রম সালাম জানাবে।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

'ভ্রান্তি শতরূপা' একটি ভ্রান্তি নিরসন মূলক বই। বাংলাদেশের কিছু লেখক ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্পর্কে ভুল তথ্য পরিবেশন করে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কাজে লিপ্ত রয়েছেন। একজন লেখক তাঁর একটি বইয়ে লিখেছেন যে, মুসলমান পুরুষ মুশরিক নারীকেও বিয়ে করতে পারে। অন্য একজন লেখক বলেছেন যে, ইসলামী শরীয়াহ্ মতে ধর্ষিতা নারী ধর্ষকের স্ত্রী হয়ে যায়। কিন্তু এই দু'টো তথ্যের একটিও সঠিক নয়, বরং নির্জলা মিথ্যাচার। মুশরিক নারী মুসলমান পুরুষের জন্য হারাম, মুশরিক পুরুষও মুসলমান নারীর জন্য হারাম। ধর্ষণকারীর জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি, ধর্ষিতার পরে তার স্ত্রী হওয়ার প্রশ্নই আসে না। অজ্ঞান লেখকসমাজের এইসব নষ্টামীর যুক্তিসঙ্গত ও তথ্যভিত্তিক জবাব 'ভ্রান্তি শতরূপা'। বইটি পড়ে ভাল লাগলে আপনার বন্ধুকে বলুন; খারাপ লাগলে আমাদের বলুন। আপনার যুক্তিসঙ্গত ও তথ্য ভিত্তিক পরামর্শ কাজে লাগাতে আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব।

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
৪৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭, ফোন: ০১৭১-১২৮৫৮৬, ০১৫৫২৩৫৪৫১৯
PPBN :095
9843114260